ভারতে ইংরাজ

('রয়্যাল লিটারারি সোসাইটী'র সদস্য, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, মেট্রোপলিটান্ কলেজের অধ্যক্ষ, ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় কৃত

England's Work in India

নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।)
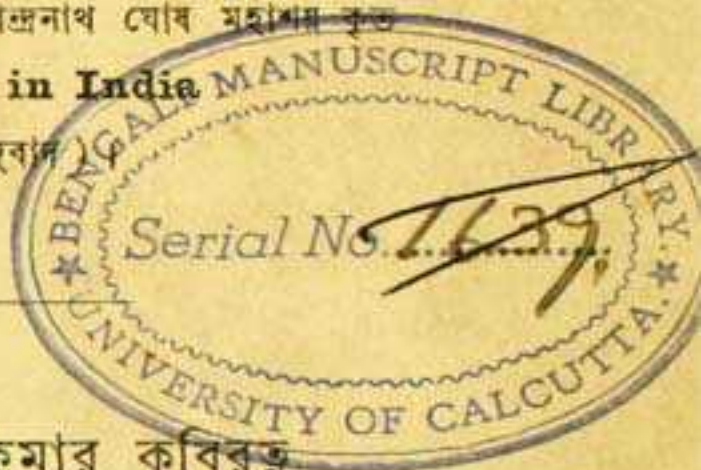
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন

এবং

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার,

প্রত্নতত্ত্ববাগীশ, বি. এ., এফ্. আর্. ই. এস্., এফ্. আর্. হিষ্ট্. এস. এম্. আর্. এ. এস্., এম্. আর্. এস্. এ., কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯১৬

সূচী

প্রথম খণ্ড

ব্রিটীশ রাজত্বে ভারতবর্ষের উন্নতি

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটীশ শাসনের মূলতত্ত্ব ১-২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্ষণশীলতার কার্য্য ৩০-৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক উন্নতি ৪০-৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ ৫৫-৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাকার্য্য ৬৯-৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধনোন্নতি ৮৯-১০২

সপ্তম অধ্যায়

দেশের বস্তুগত উপাদান সম্বন্ধীয় উন্নতি ১০৩-১১৯

অষ্টম অধ্যায়

প্রজার অধিকার ১২০-১৩০

নবম অধ্যায়

ইংরাজ শাসনের ফল ১৩১-১৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতি

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ১৪১-১৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামরিক শাসন ব্যবস্থা ১৪৪-১৫১

তৃতীয় অধ্যায়

উচ্চতর শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগ ... ১৫২-১৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

অধস্তন শাসন বিভাগ ১৬৮-১৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম্মাধিকরণ ১৭৬-১৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজস্ব ও আয়ব্যয় ১৮২-১৯২

সপ্তম অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য ১৯৩-১৯৬

প্রথম খণ্ড

ব্রিটীশ রাজত্বে ভারতবর্ষের উন্নতি

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটীশ শাসনের মূলতত্ত্ব

উপক্রমণিকা—শাসনতন্ত্রের অসুবিধা—যেরূপ নীতিতন্ত্র অবলম্বিত হইতে পারিত এবং যাহা অবলম্বিত হইয়াছে—সংরক্ষণ ও সংস্কার—সাম্রাজ্যের বৃহত্ব—লোকসংখ্যা—ভাষার বিভিন্নতা—জাতিধর্ম্মগত বৈষম্য—অভিন্ন শাসনতন্ত্র—সাধারণ স্বত্ব ও কর্ত্তব্য—অভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থা—ব্রিটীশ শাসনের মৌলিকতত্ত্বের কীর্ত্তন—লোকরক্ষা বিধি—সংস্কার বিধি—মহারাণীর ঘোষণাপত্র—সপ্তম এডওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণা—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এবং সম্রাজ্ঞীর নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন এবং সম্রাটের উত্তর।

ভারতবর্ষ শাসনে ইংলণ্ডকে এক গুরুতর ও অদ্বিতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এক দেশের পক্ষে সুদূর হইতে অন্য দেশ শাসন যে অতি কঠিন কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে দেশকে শাসন করিতে হইবে, তাহা যদি বিশালায়তন ও তাহার অধিবাসীসংখ্যা যদি অত্যধিক হয় এবং সে সকল অধিবাসী যদি পরস্পর বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয় এবং তাহারা যদি রাজজাতি হইতে বর্ণে, ধর্ম্মে, ভাষায়, আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয়, তবে তাহার শাসনকার্য্য যে কিরূপ কঠিন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতে ব্রিটীশ শাসনের প্রথমাবস্থায় ইংরাজের শাসনাধীন স্থান স্বল্পায়তন ছিল। তখন লোকসংখ্যাও এত অধিক ছিল না। তখন সামান্যরূপ অন্নবস্ত্রে ও চালচলনে লোকে সন্তুষ্ট থাকিত।

তখন ইংলণ্ডে ও ভারতে এত ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। তখন এই সুবিস্তীর্ণ ভারতের একস্থানের লোকের সহিত অন্যস্থানের লোকের এরূপ সংশ্রব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এজন্য যে স্থানে যাহা সুলভ, সেই স্থানের লোক তাহাতেই তুষ্ট থাকিত। তখন এ দেশ ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণের-নিকট ও এদেশের নিকট রাজপুরুষগণ স্বল্পপরিচিত ছিলেন, এবং এদেশে রাজপুরুষগণের সংখ্যাও অল্প ছিল। তখন দেশে একটী অভিনব রাজতন্ত্র প্রণালীর প্রবর্ত্তনে যে সকল অসুবিধা ও বাধা বিঘ্ন ঘটা সম্ভব তাহা ঘটিয়াছিল। অতএব অধুনা ভারতশাসন কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ হইলেও অনেক বিষয়ে সহজ হইয়াছে।

ইংরাজ জাতি যখন আপনাদিগকে পরদেশ-শাসনে ভার প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিলেন, তখন তাঁহারা বহু শাসনতন্ত্রপ্রণালীর যে কোনও একটা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তখন তাঁহারা স্বজাতির জন্য একপ্রকার ও ভারতবাসীর জন্য অন্যপ্রকার শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহারা বিবিধ অযোগ্যতার ব্যপদেশে ভারতবাসিগণকে, করস্থাপন, বাণিজ্য, কর্ম্মচারীনিয়োগ প্রভৃতি বিবিধ রাজকীয় পদ ও ব্যবসায় হইতে অধিকারচ্যুত করিতে পারিতেন। তাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দ্বারা, কোন শ্রেণীর প্রতি অনুগ্রহ ও কোন শ্রেণীর প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিতেন। অথবা ভারতের জন্য নূতন শাসনপ্রণালী প্রণয়নের কষ্ট ও চিন্তা স্বীকার না করিয়া স্বদেশেরই সমস্ত বিধিব্যবস্থা ভারতে প্রবর্ত্তিত করিতে, এবং ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত সমস্ত বিধিব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে পারিতেন। অথবা ভারতের চিরাচরিত বিধিব্যবস্থাসকল তাঁহাদের নিজের দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ হউক না কেন, ভারতবাসীর পক্ষে উহাই হিতকর, ইহা ভাবিয়া, ঐ সকল বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ না করিতেও

পারিতেন। অথবা, তাঁহারা যদি একটী মনোমত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ সমাজ-তন্ত্র-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইতেন, তবে তাঁহারা স্বদেশের ও ভারতের প্রচলিত সমস্ত বিধিব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া, স্বাধিকৃত ভারতে একটী সম্পূর্ণ অভিনব রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন।

ভারতে যে নীতি তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন (অবশ্য ইহাই তাঁহাদের অবলম্বনীয় অন্যতর পন্থা), তাহা এদেশের পূর্ব্বপ্রচলিত নীতির সম্পূর্ণ অনুকূল বা প্রতিকূলও নহে। কারণ তাঁহারা ভারতে একটী স্বকপোল-কল্পিত আদর্শ-শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা করেন নাই। ভারতে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রাজনীতি অতীব সতর্কতাসহকারে অবলম্বিত। ইহাকে সংরক্ষণ ও সংস্করণ, এ উভয়ের সামঞ্জস্য বলা যাইতে পারে। এ দেশ যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ মহতী উন্নতির দিকে গতিশীল হয়, এ নীতি ঠিক সেই ভাবেই অবলম্বিত। ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা প্রথম হইতেই যাহা এদেশের লোকের প্রকৃত কার্য্যোপযোগী, তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব বা একীভাব বিষয়ে সেরূপ লক্ষ্য রাখেন নাই। যাহা কিছু ন্যায় ধর্ম্মানুসারে দূষণীয় বা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অব্যবহার্য্য বা অনিষ্টকর, এরূপ বিষয় পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে, তাঁহারা এদেশে কোনও নূতন প্রকরণের সৃষ্টি করেন নাই। ন্যায়পরতা ও সুশাসনের কতকগুলি মৌলিক উপাদান যে সমস্তদেশে সমভাবে ব্যবহার্য্য, তাহা তাঁহারা কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র শাসনতন্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা ও তাহার আনুষঙ্গিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই সেই স্থানের উপযোগিতা অনুসারেই নিরূপিত হইয়াছে। এক কথায়, যথায় যতদূর সম্ভব, তাঁহারা বিশুদ্ধ স্বদেশীয় ভাবসকল ও চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর প্রতি, এবং প্রাচীনত্বের সংরক্ষণ ও পরিপোষণ বিষয়ে যথোচিত যত্ন প্রকাশ

করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, তাঁহারা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্বজাতীয় সমুন্নতভাবের পরিচায়ক অনেক বিধিব্যবস্থা যথাসম্ভব ভারতীয় প্রাচীন শাসনতন্ত্রের মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রাচীনত্বের যথোচিত সংরক্ষণ ও নূতনত্বের যথোচিত প্রবর্ত্তন দ্বারাই ইংরাজাধিকৃত ভারতে বর্ত্তমান মহোন্নতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব, ভারতে ইংরাজশাসনজনিত উন্নতির বিষয় বলিতে হইলে, দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়; প্রথম, এদেশের চিরাচরিত ব্যবহার প্রণালীর অখণ্ড-ভাবে সংরক্ষণ; দ্বিতীয়, উক্ত ব্যবহার প্রণালীর আবশ্যকমত সংস্করণ ও স্থলবিশেষে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবের প্রবর্ত্তন।

ভারত-সাম্রাজ্য ১৮,৩৩,০০০ বর্গ মাইল—ইহা হইতেই ইহার বিশাল আয়তন অনুমিত হইতে পারে। ব্রিটীশ-শাসিত প্রদেশের আয়তন ১১,২৪,০০০ বর্গ মাইল এবং দেশীয় রাজাধিকারভুক্ত স্থানের পরিমাণ ৭,০৯,০০০ বর্গ মাইল। সান্‌ষ্টেট প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত বর্ম্মা (২,৩০,৮৩৯ বর্গ মাইল), মাদ্রাজ (১,৪২,৩৩০ বর্গ মাইল), এডেন সহিত বোম্বাই (১,২৩,০৫৯ বর্গ মাইল), এবং যুক্তপ্রদেশ (১০৭,২৬৭ বর্গ মাইল), এইগুলিই ব্রিটীশ-শাসিত প্রদেশ সমূহ মধ্যে সুবৃহৎ। কিছুদিন পূর্ব্বে সম্পাদিত রাষ্ট্রবিভাগের ফলে বিহার এবং উড়িষ্যা ৮৩,১৮১ বর্গ মাইল ভূমি, এবং বঙ্গদেশ তাহার অষ্টাবিংশ জিলা সমেত ৭৮,৬৯৯ বর্গ মাইল ভূমি বেষ্টন করিয়াছে। আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত প্রদেশের পরিমাণ ৫৩,০১৫ বর্গ মাইল।

গত আদমসুমারিতে নির্দ্ধারিত লোকসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ৩১,৫১,৫৬,৩৯৬। তন্মধ্যে ২৪৪,২৬৭,৫৪২ ব্রিটিশরাজ্যে এবং ৭০,৮৮৮,৮৫৪ দেশীয় রাজাধিকারভুক্ত প্রদেশে গণিত হইয়াছে। আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশের লোকসংখ্যা ৪,৭১,৮২,০৪৪ এবং এই প্রদেশের লোকসংখ্যাই অত্যধিক। তৎপরে বঙ্গদেশ—ইহার লোকসংখ্যা ৪৫,৪৮৩,০৭৭।

বিহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ৩,৯৪,৯০,০৮৪। বোম্বাই প্রদেশের পরিমাণ ১,২২,৯৭৯ বর্গ মাইল হইলেও, ইহার লোকসংখ্যা ১,৯৬,২৬,৪৭৭ কিন্তু, পাঞ্জাব মাত্র ৯৯,৭৭৯ বর্গ মাইল পরিমিত হইলেও, লোকসংখ্যা ১৯,৯৭৪,৯৫৬।

১৯০১ সনের তুলনায় লোকসংখ্যা ২,০৭,৭১,৫৮১ (অর্থাৎ শতকরা ৭·১) বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু, এই বৃদ্ধির কতক কারণ এই যে, ইহার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের ১,৭৩,১১৬ লোককে (এই লোকসংখ্যা ঠিক গণিত হয় নাই, অনুমান করা হইয়াছে মাত্র) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ব্রিটীশ-রাজত্বে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫·৫ মাত্র; কিন্তু অন্যান্য স্থানে শতকরা ১২·৯ বৃদ্ধি পাইয়াছে। *

ভারত-সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যূন ২২০টী বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত, তন্মধ্যে ৩৮টী ক্ষুদ্র। এই সকল ভাষার অধিকাংশকেই প্রধানতঃ তিনটী বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ইণ্ডো-চাইনিজ্ (Indo-Chinese) ভাষা, হিমালয় প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও উত্তর-পূর্ব্বভারতে প্রচলিত। দ্রাবিড়-মুণ্ডা (Dravido-Munda) ভাষা সকল প্রধানতঃ দক্ষিণ ও মধ্যদ্বীপ-কল্প (Peninsula) মধ্যে প্রচলিত। ইণ্ডো-য়ুরোপীয় (Indo-European) ভাষা, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং পাঞ্জাব, বোম্বাই, বঙ্গ, আসাম এবং হায়দ্রাবাদ ও হিমালয়ের অন্তরালবর্ত্তী প্রদেশে প্রচলিত।†

ভারতসাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ জাতি তত্ত্বানুসারে প্রধানতঃ সপ্তধাজাতিলক্ষণে বিভক্ত হইতে পারে।‡ ইহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম

---

* জে. এস্. কটন্ প্রণীত "ব্রিটানিকা বাৎসরিক পুস্তক" দ্রষ্টব্য।

† ১৯১১ সনের আদমশুমারির রিপোর্টের নবম অধ্যায়।

‡ ১৯১১ সনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

সকলকেও সপ্তপ্রকার প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই সকল সাম্প্রদায়িকধর্ম্মকে আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করা যায়। *

যে দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যা এত অধিক এবং বহুধা জাতি বর্ণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আকৃতি প্রকৃতি শাখা, প্রশাখা প্রভৃতিতে বিভক্ত, তথায় পরস্পর মধ্যে জীবন-প্রণালী—চিন্তা—মনোভাব—ভাষা—স্বার্থ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে যে অসংখ্য ভেদ আছে, তাহা বলা বাহুল্য। এই লোকমণ্ডলী যে এক্ষণে একসূত্র ইংলণ্ডশাসনের অধীন, ইহা ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এই বহুধা-ভিন্ন-লোকমণ্ডলী মধ্যে ইংরাজের সাধারণ শাসনতন্ত্র নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং উহার আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক সাধারণ অধিকার ও কর্ত্তব্যপরম্পরা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় লোকমধ্যে পরস্পর জাতিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ বিসম্বাদ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খৃশ্চান, প্রভৃতিরা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ীক, পৃথক পৃথক ভজনালয়ে, নির্ব্বিবাদে উপাসনাদি করিতে পারে; পৃথক পৃথক শিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণ করিতে পারে; স্ব স্ব সামাজিক জীবনে পৃথক পৃথক আচার পদ্ধতির অবলম্বন করিতে পারে;—ইহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই। এই পার্থক্যে পরস্পরে ঈর্ষা দ্বেষাদিও কিছু কিছু ঘটিতে পারে। এরূপ নানা পার্থক্য সত্ত্বেও সর্ব্বসাধারণের রাজনৈতিক অবস্থা অভিন্ন; অর্থাৎ সকলেই একই সাম্রাজ্যের প্রজা, সকলেই সাধারণ স্বত্ত্বে এবং দায়িত্বে স্বত্ববান্, সাধারণ কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে সকলেই আবদ্ধ। ধর্ম্ম বা সমাজ বিষয়ে স্বাধীনতা সকলেরই সমান। পরস্পরের মনে বিদ্বেষভাব যতই প্রবল থাকুক, কেহ কাহারও সামাজিক নিয়মে বা ধর্ম্মকর্ম্মাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

* ১৯১১ সনের রিপোর্টের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দপত্র পার্লিয়ামেণ্টের আইনদ্বারা নূতন করিয়া দেওয়া হইল, তখন উক্ত বিধির ৮৭ ধারা দ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল যে, কোম্পানির অধিকৃত প্রদেশসমূহে কোনও দেশীয় বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অধিকার-জাত ব্যক্তি, নিজ বর্ণ, ধর্ম্ম, জন্মস্থান বা বংশাদির বা সামাজিক পদ-মর্য্যাদাদির পার্থক্য হেতু, কোম্পানির সরকারে কোনও পদে বা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। স্যার কোর্টনে ইলবার্ট্ (Sir Courteney Ilbert) যথার্থই বলিয়াছেন, দেশশাসন কার্য্যে ভারতবাসিগণের এরূপ অবাধ প্রবেশাধিকার ইতিপূর্ব্বে কখনও এত উদার ও দৃঢ়ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। *

উক্ত আইনের অন্য একটী ধারায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, প্রজাগণের প্রতি উৎপীড়নের আশঙ্কা ঘটিলে ইংলণ্ডের ভারতীয় প্রজা মাত্রেই, যাহাতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সমাজ বা সম্প্রদায়াদি-বিষয়ক অত্যাচার ও অপমান প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে, মন্ত্রি-সভাসীন গভর্ণর জেনেরাল মহোদয় অবিলম্বে তাহার সুব্যবস্থা সর্ব্বপ্রযত্নে করিবেন।

সেই শাসনলিপি দ্বারা ইহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, সভাসীন গভর্ণর জেনেরাল মহোদয় ভারতের সর্ব্বত্র দাসত্ব প্রথার প্রশমনে মনোযোগী হইবেন, এবং দাসগণের অবস্থোন্নতি-বিষয়ে এবং ভারতীয় ইংরাজ সাম্রাজ্যে দাসত্ব প্রথার উন্মূলন বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এবং তিনি এবিষয়ে আইনের যে পাণ্ডুলিপি (খসড়া) প্রস্তুত করিবেন তাহা "কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স" (Court of Directors) সভায়

---

* উক্ত লেখক প্রণীত "ভারত গবর্ণমেণ্ট" নামক পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অনুমোদনার্থ প্রেরণ করিবেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সময়, বৈবাহিক বিধিব্যবস্থা বিষয়ে এবং পিতার ও পরিবারস্থ কর্ত্তৃত্ব ও স্বত্বাদি বিষয়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করার জন্যও আদেশ প্রদান করা হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সমগ্র শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ কালে, যে বিখ্যাত ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতে ইংরাজ শাসনের অত্যুদার প্রজাপালননীতি প্রকটিত হইয়াছিল; মন্ত্রি-সভাসীনা মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভারতের সমস্ত রাজ রাজন্য ও প্রজাবর্গের প্রতি এই ঘোষণা পত্র প্রচার করাইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদ্বয়,—সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সহানুভূতিপূর্ণ ঘোষণা ও উক্তি যত্নের সহিত পাঠযোগ্য এবং তাহা হইতেও বর্ত্তমান অবস্থা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সে গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র

গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়ারলণ্ড—এই যুক্তরাজ্য এবং উহার উপনিবেশ সমূহ ও অধীনস্থ দেশ সকল, যাহা য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে অবস্থিত, ঈশ্বরকৃপায় আমি ঐ সমস্ত দেশমণ্ডলের একমাত্র অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষিণী।

বিবিধ গুরুতর কারণপরম্পরা উপস্থিত হওয়ায়, আমরা আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট, সমবেত লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারে নিযুক্ত অভিজাতবর্গ ও সাধারণ প্রতিনিধিবর্গের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছি যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহের শাসনভার, যাহা এযাবৎ আমাদের প্রতিভূস্বরূপ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহা এক্ষণে স্বহস্তে গ্রহণ করিব।

এজন্য এক্ষণে এই ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছি, যে, উক্ত মহাসভার সভ্য মণ্ডলীর অবিসংবাদিত সম্মতিক্রমে আমরা ভারতের সম্পূর্ণ শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম।

এতদ্দারা মদীয় ভারত-সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজাবর্গকে জ্ঞাত করিতেছি, যে, তাঁহারা সকলেই যেন পরম বিশ্বাসাস্পদ রাজভক্ত হয়েন। সকলেই যেন আমাদের ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণের প্রতি অকপট অধীনতা স্বীকার করেন। বর্ত্তমান কালে আমরা যাঁহাদিগকে ভারত শাসনে নিযুক্ত করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে (সময়ে সময়ে) আমাদের নামে ও পক্ষে, যোগ্যতানুসারে যাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিব, তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীন হইয়া সমস্ত প্রজামণ্ডলী* যেন নির্ব্বিবাদে অবস্থান করেন।

আমরা আমাদের পরম স্নেহাস্পদ বিশ্বাসভাজন, আত্মীয় চার্লস্ জন্ ক্যানিং ভাইকাউন্ট্ মহোদয়কে আমাদের সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম রাজপ্রতিনিধি ও সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা (Viceroy and Governor General) নিযুক্ত করিলাম। এখন হইতে তিনি আমারি নামে ও পক্ষে প্রতিনিধি হইয়া দেশ-শাসন করিবেন। সময়ে সময়ে তিনি আমার অন্যতম সচিব (Secretary of State) দ্বারা যে সকল রাজকীয় আদেশ ও নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাকে তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

এক্ষণে যাঁহারা মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সাধারণ ও সামরিক (Civil and Military) বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা তাঁহাদের নিজ নিজ পদেই স্থায়ী রাখিলাম। কিন্তু অতঃপর তাঁহাদিগকে আমাদের ইচ্ছা এবং প্রচলিত বিধিব্যবস্থাদির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে।

আমরা এতদ্বারা দেশীয় রাজন্যবৃন্দকে জানাইতেছি, মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বে ও ইচ্ছায় দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত যে সকল সন্ধিবন্ধন ও স্বত্বাদি ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সে সকল আমাদের অনুমোদিত ও অব্যাহত রহিল, এবং ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্নভাবে রক্ষিত হইবে। তাঁহারাও যেন সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের সহিত তাঁহাদের সে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখেন।

বর্ত্তমান কালে আমাদের ভারতে স্বাধিকার বিস্তারের ইচ্ছা নাই। কিন্তু অপরে আমাদের অধিকার বা স্বত্বাদির উপর হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা আমরা কদাপি সহ্য করিব না। কেহ যদি অন্যায় রূপে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহাও আমরা অনুমোদন করিব না।

ভারতে দেশীয় রাজগণের স্বত্ব, অধিকার, পদ, মর্য্যাদা প্রভৃতিকে আমরা আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি যথোচিত সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিব। আমাদের ইহাই আন্তরিক বিশ্বাস, যে দেশীয় রাজগণের ও আমাদের নিজের প্রজাবৃন্দ, উভয়ই উভয় পক্ষের আভ্যন্তরিক সুশাসন ও শান্তি দ্বারাই, সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি ও সামাজিক মহোন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।

আমাদের অন্যান্য অধিকারস্থ প্রজাবৃন্দের প্রতি আমরা যে সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য, আমাদের ভারত প্রদেশের প্রজাবৃন্দের প্রতিও আমরা সেই সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য রহিলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কৃপায়, আমরা বিশুদ্ধ হিতাহিত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, বিশুদ্ধ ভাবে ঐ সকল কর্ত্তব্য যথাবিধি পালন করিব।

যদিও খৃষ্টধর্ম্মের উপর আমাদের একান্ত বিশ্বাস, এবং আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধর্ম্মজনিত শান্তি ও সান্ত্বনাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করি, তথাপি আমরা কদাচ আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে আমাদের কোনও প্রজার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার অধিকার বা অভিসন্ধি রাখিব না।

আমাদের এই রাজকীয় ইচ্ছাকে আমরা দৃঢ়ভাবে ও সানন্দে বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে আমাদের অধিকারে স্ব স্ব ধর্ম্ম বিশ্বাস ও তদনুরূপ ব্রত নিয়মাদি পালন জন্য কেহই আমাদের কোনও প্রকার অনুগ্রহের বা নিগ্রহের ভাজন হইবে না। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সকল লোকেই আমাদের অপক্ষপাত, সমদৃষ্টি ব্যবস্থা বিধির রক্ষাধীন হইবে। দেশ রক্ষায় নিয়োজিত আমাদের রাজপুরুষগণকেও আমরা বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিব যে, তাঁহারা সকলেই যেন আমাদের ভারতীয় প্রজাবর্গের স্ব স্ব ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও তদনুরূপ পূজোপাসনাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে

সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত থাকেন। যিনি আমাদের এ শাসন লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমাদের নিরতিশয় বিরক্তিভাজন হইবেন।

অপিচ, ইহাও আমাদের ইচ্ছা, যে আমাদের ভারতীয় প্রজারা, যে জাতীয় বা যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, তাহারা তাহাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, ন্যায়পরতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ দ্বারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, অবাধে ও অপক্ষপাতে তদনুরূপ রাজকীয় কার্য্যসমূহে নিয়োজিত হইবে।

ভারতবাসীরা উত্তরাধিকাররূপে লব্ধ পৈতৃক সম্পত্তিকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করে, তাহা আমরা জানি এবং তাহাদের এই ভক্তি-ভাবকে আমরা সম্মান করি। এজন্য আমরা সেই সকল সম্পত্তির উপর তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বৈধ স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের রাজকীয় কার্য্যের জন্য ন্যায়ধর্ম্মানুসারে রাজপ্রাপ্য অংশ ভিন্ন অন্য কোনরূপ দাবি করিব না। এতদ্বিষয়ে কোনও বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিবার সময়ে, আমরা ভারতের চিরাচরিত অধিকার ও আচার পদ্ধতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিব।

কতকগুলি অপরিণামদর্শী দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া ভারতে যে অনিষ্ট ও কষ্ট আনয়ন করিয়াছে, সে জন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ঐ সকল লোক অমূলক সংবাদ রটনা করিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়গণকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। উক্ত বিদ্রোহের নিবারণকালে কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের শক্তি ও প্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা অন্যের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া উক্ত বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, তাহারা যদি এক্ষণে কর্ত্তব্য-পথে পুনরাগমন করে, তবে আমরা দয়া করিয়া তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করি।

যাহাতে আর অধিকতর রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়, এবং অচিরেই যাহাতে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়, এই ইচ্ছায় আমাদের রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরাল মহোদয় ইতিমধ্যেই একটী প্রদেশে ক্ষমা প্রদর্শনের আশা দিয়াছেন। যাহারা বিগত সিপাহীবিদ্রোহে আমাদের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপরাধী, তিনি দয়া করিয়া, কতকগুলি সর্ত্তে ঐ সকল ব্যক্তির অধিকাংশকে ক্ষমা করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের অপরাধ এত গুরুতর যে, তাহা ক্ষমাগুণের অতীত, কেবল তাহাদেরই প্রতি দণ্ডবিধানের ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরালের ঐ ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম, এবং উহাকে স্থিরতর রাখিলাম। অপিচ, আমরা ইহাও ঘোষণা করিতেছি যে ঃ—

ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত থাকার জন্য যাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বা হইবে, তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, ন্যায়পরতার সম্পূর্ণ বিরূদ্ধ। তদ্ভিন্ন আর সকল অপরাধীর প্রতি আমাদের দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে।

যাহারা ইংরাজহত্যাকারিগণকে জানিয়াও, ইচ্ছা পূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছে, অথবা যাহারা উক্ত বিদ্রোহের নেতা বা মন্ত্রণাদাতা, তাহাদের কেবল প্রাণদণ্ড মাত্র রহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের অপরাধানুরূপ দণ্ড দান কালে, তাহারা যেরূপ ঘটনা চক্রে পড়িয়া রাজভক্তির শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছিল, ও রাজদ্রোহে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিবেচিত হইবে। যে সকল দুর্ব্বলচেতা, সহজ বিশ্বাসী ব্যক্তি, দুষ্টাশয় লোকগণের অলীকসংবাদ রটনায় ও কুমন্ত্রণা কুহকে পড়িয়া অপরাধ করিয়াছে, বিচারকালে তাহাদের বিষয়ে বহুলপরিমাণে ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে।

এতদ্ভিন্ন, বিদ্রোহসংস্পৃষ্ট আর সকলের প্রতি আমরা সর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া, নিরঙ্কুশ ক্ষমা ও দয়া ঘোষণা করিতেছি। তাহারা এক্ষণে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শান্ত ভাবে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করুক।

ইহাই আমাদের ইচ্ছা যে, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে আমাদের এই সকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবে, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমাদের ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শিত হইবে।

যখন ঈশ্বরকৃপায় ভারতে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, যাহাতে ভারতে প্রশান্তভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি, সাধারণ হিতকর ও শ্রীবৃদ্ধিকর (পথ পূর্ত্তাদি) কার্য্য সমূহ ও সংস্কার সমূহ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ভারতবাসিগণের মঙ্গলার্থেই উহার শাসন প্রণালী সংগঠিত হয়, তৎপক্ষে আমরা সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। ভারতবাসিগণের সমৃদ্ধিই আমাদের শক্তি, তাহাদের সন্তোষই আমাদের সর্ব্ব সঙ্কটে রক্ষা কবচ, তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমাদিগকে এবং ভারত শাসন-নিযুক্ত অস্মদীয় কার্য্যাধ্যক্ষগণকে এরূপ শক্তি দান করুন, যদ্দ্বারা ভারতবাসিগণের সুমঙ্গলার্থে আমাদের এই সকল শুভকামনা পূর্ণ হয়।

ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দের প্রতি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে,
২রা নভেম্বর তারিখের

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের ঘোষণাপত্র

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, আমার স্নেহময়ী জননী ও এই সকল রাজ্যের ভূতপূর্ব্বা মহিমান্বিতা পূর্ব্বাধিকারিণী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নানাবিধ গুরুতর কারণে, পার্লিয়ামেণ্টের উপদেশ ও অভিমত্যানুসারে, ইতঃপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক শাসিত প্রদেশ সকলের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধিপূর্ব্বক গৃহীত সেই সুমহান্ কার্য্যের স্মরণার্থ আমরা ভারতবর্ষের রাজন্য ও প্রজাবর্গকে অভিবাদন করিবার এই উপযুক্ত সময় মনে করিতেছি। সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের নিকট অর্দ্ধ শতাব্দী অতি অল্পকাল হইলেও, যে অর্দ্ধ শতাব্দী অদ্য পর্য্যবসিত হইল, তাহা ঐতিহাসিক যুগ-প্রবাহ মধ্যে একটী অত্যুজ্জ্বল চিহ্ন রূপে পরিণত হইবে। ইংলণ্ডের রাজশক্তি কর্ত্তৃক ভারতীয় শাসন ভার গ্রহণের ঘোষণা ভারতীয় শাসনের একতা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। ঐ কার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়াছিল এবং সময় সময় উন্নতির গতি অত্যন্ত মন্থর বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু, ইংরাজ শাসনে ও উপদেশে বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং প্রায় ত্রিশ কোটী লোকের একত্রীকরণ, দৃঢ়রূপে এবং অপ্রতিহত ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর কার্য্যাবলী পরিষ্কার ভাবে এবং নির্ম্মল বিবেকের সহিত পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেছি।

মনুষ্যের শাসন কার্য্যে সর্ব্ব যুগে এবং সর্ব্বত্র যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই শাসনেও প্রতিদিন সেইরূপ বিঘ্ন সমূহ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারিগণ পরিশ্রম, সাহস, ধৈর্য্য ও গভীর চিন্তা-প্রসূত পরামর্শের সহিত এবং অবিচলিত ও স্থির চিত্তে ঐ সকল বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। ভ্রম ঘটিয়া থাকিলে আমার কর্ম্মচারীবৃন্দ ঐ গুলি সংশোধন করিতে কদাপি পরিশ্রমে বা ত্যাগ-স্বীকারে বিমুখ হন নাই; কুপ্রথা প্রমাণিত হইলে, উহা সংশোধনের জন্ত তাঁহারা বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন।

কোন প্রক্রিয়া দ্বারাই জলকষ্ট বা মহামারী নিবারণ করা যায় না; তবে বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিকগণ কৌশল ও কার্য্যানুরাগ দ্বারা ঐ জাতীয় বিপদ সকল হ্রাস করিতে যাহা সম্ভব তাহা করিয়াছেন। আপনাদিগের দেশে পূর্ব্বে শান্তি বহুদিন অজ্ঞাত ছিল; আপনারা এই রাজ্যে যুদ্ধের ভয়াবহ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, অবিরত আভ্যন্তরীণ শান্তি ভোগ করিতেছেন।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, ১৮৫৮ সালে যাহাতে ভারতবর্ষের শিল্প নির্ব্বিরোধে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সাধারণ হিতকর ও উন্নতিশীল কার্য্য বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সকল অধিবাসীর মঙ্গলার্থে, মহৎ আশ্বাস সমন্বিত শাসন পত্র আপনাদিগকে প্রদান করেন। আপনাদিগের আর্থিক সুখ ও উন্নতি-সূচক যে সকল অভিসন্ধি—গুরুত্বে ও নির্ভীকতায় যাহাদের সমকক্ষ আর দৃষ্ট হয় না—যত্ন পূর্ব্বক কল্পিত ও কার্যে পরিণত হইয়াছে, সেই গুলিই জগতের সম্মুখে, আমরা কিরূপ উৎসাহে এই সকল করুণাপূর্ণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

করদ ও মিত্ররাজগণের স্বত্ব এবং বিশেষাধিকার সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত, রক্ষিত ও পালিত হইতেছে এবং তাঁহাদিগের

রাজভক্তিও অটুট রহিয়াছে। আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে কোন ব্যক্তিই নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম্মের জন্য অনুগৃহীত, পীড়িত বা ত্যক্ত হন নাই। সকলেই আইন দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন। জাতি বর্ণ এবং সম্প্রদায় গত আচার ব্যবহার ও মতনির্ব্বিশেষে আইন প্রয়োগ করা হইতেছে। সরল ভাবে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায় নূতন অবস্থার মধ্যে পড়িলে যেরূপ আবশ্যক তাহা বুঝিয়া আইন তদুপযোগী করিয়া লওয়া হইতেছে।

আমার উপর যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত রূপে বহন করার উপর বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে বহুসংখ্যক লোকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। অন্যায় ও উদ্দেশ্যহীন দূষণীয় ষড়যন্ত্র সমূহের মূলোৎপাটন আমার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা অবগত আছি আমার বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিকট এই ষড়যন্ত্র সমুহ অতিশয় ঘৃণার্হ বলিয়া মনে হয় এবং এই সকল ষড়যন্ত্র সমূহ যাহাতে আমাদিগকে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে বিরত করিতে না পারে, আমরা তাহা করিব।

এই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার অসাধারণ নিদর্শন স্বরূপ ১৯০৩ সালে আমার অভিষেক উপলক্ষে যে প্রকার আদেশ করা হইয়াছিল, এবার সেই প্রকার আদেশ করিয়াছি যে, যে সকল অপরাধী আমার বিচারালয় সমূহ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস কিংবা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয় এবং আমার এইরূপ বাসনা যে এই সকল অপরাধীগণ যেন সর্ব্বদা এই দয়ার বিষয় স্মরণ রাখে এবং এখন হইতে যেন কোনও অপরাধ না করে।

সাধারণ কার্য্য সংক্রান্ত চাকুরীতে নিয়োগ কালে জাতিভেদ জনিত অসুবিধা-নিরাকরণ ধীরে ধীরে সংঘটিত হইতেছে। আমি সম্পুর্ণরূপে

বিশ্বাস ও আশা করি যে, ভারতবাসিগণের সূক্ষ্ম প্রতিভা ও উপযুক্ত যোগ্যতাদ্বারা অর্জ্জিত শিক্ষা-বিস্তৃতি, দূরদর্শিতা-বৃদ্ধি এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অপ্রতিহত ও নিশ্চিতরূপে সাধিত হইবে।

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আমার প্রতিনিধি (Viceroy) ও গবর্ণর জেনেরাল এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গের মতে ঐ প্রথা সাবধানতা সহকারে বিস্তার করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী, যাঁহারা বৃটিস-শাসন কর্তৃক পোষিত এবং অনুপ্রাণিত মতের আদর্শস্থল, ইংরাজগণের ন্যায় এক স্বত্ব ও অধিকার সহিত আইন প্রণয়ন এবং শাসন কার্য্যে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার দাবী করেন। এই প্রকার দাবী কিয়দংশে পূর্ণ করিলে বর্ত্তমান রাজশক্তি এবং ক্ষমতার বৃদ্ধিই করিবে—কদাচ হ্রাস করিবে না। যাঁহারা শাসন শক্তি পরিচালনা করেন, যদি তাঁহারা শাসিতদিগের সহিত এবং যাঁহাদের সাধারণের মতামতের উপর ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগের সহিত মিশিবার অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে শাসন কার্য্যের সমধিক উন্নতি সাধন হইবে। এতদুদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহা প্রকাশ করিব না; এক্ষণে উহা শীঘ্রই আপনাদিগকে জ্ঞাপন করা হইবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস উহা আপনাদিগের উন্নতির পক্ষে বিশেষ হিতকরী হইবে।

আমার ভারতীয় সৈন্যবৃন্দের শৌর্য্যবীর্য্য এবং বিশ্বস্ততা আমি সম্পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করি এবং যাহাতে তাহাদিগের সামরিক গুণ, নিয়ম-পরায়ণতা এবং কর্ম্মস্পৃহা উপযুক্তরূপে আদৃত হয়, তজ্জন্য নব বৎসরে আমি ব্যবস্থা করিয়াছি।

ভারতবর্ষের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিশেষ আদরণীয় ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমার ভারতগমনের পর হইতেই ভারতের নৃপতি ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের বিষয় সর্ব্বদা আমি সস্নেহ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সে চেষ্টা কদাচ ক্ষীণ হইবে না।

আমার প্রিয়তম পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এবং তদীয় পত্নী প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্ আপনাদিগের সহিত অবস্থান করিয়া আপনাদিগের দেশের প্রতি অনুরাগ এবং তাহার উন্নতি ও সুখের কামনা লইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ভারতের প্রতি এই অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভারতবর্ষের হিতসাধনের ইচ্ছা এই রাজ্যের সকলের সম্যক হিতেচ্ছার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আমার উপর যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে সেরূপ ভার ঐতিহ্যকালের কোন রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা বা প্রজাবৃন্দের উপর ন্যস্ত হয় নাই। এরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদনে যে জ্ঞান এবং পরস্পরের প্রতি সৌহৃদ্য আবশ্যক, তাহা যেন শ্রীভগবানের আশ্রয়ে এবং অনুগ্রহে বলবতী হয়।

মহামহিমান্বিত সম্রাট্ শ্রীশ্রীমান্ পঞ্চম জর্জ্জ কর্তৃক রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ঘোষণা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ১২ই ডিসেম্বর।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সন্তোষের সহিত আমরা অদ্য আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। সম্রাজ্ঞী এবং আমি, এই বৎসর বহু উৎসবে যোগদান করিয়াছি এবং তজ্জন্য গুরুভার বহন করিতে হইলেও, তাহা আমাদিগের পক্ষে বিশেষ সুখকর হইয়াছে। আমরা যে দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম, গতবারের ভারতাগমনের সুখকর স্মৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় আমরা সেই দেশে আসিয়াছি। এখানে আমরা প্রবাসে অবস্থান করিয়াও গৃহসুখ অনুভব করিয়াছি, এই দেশ পুনর্ব্বার দর্শন করিবার জন্য আমরা উচ্চ আশান্বিত হইয়া এই সুদীর্ঘ-ভ্রমণে ব্রতী হইয়াছিলাম।

জুন মাসের দ্বাবিংশ দিবসে "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে" জগদীশ্বরানুকম্পায় প্রাচীন আচার ও প্রথানুসারে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজমুকুট মস্তকে গ্রহণ সময়ে আপনাদের নিকট স্বয়ং এই অভিষেক ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; গত জুলাই মাসে সে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইল।

সম্রাজ্ঞীর সহিত আগমন করিয়া রাজভক্ত রাজন্যবর্গ এবং বিশ্বস্ত ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং ভারত-

সাম্রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি ইচ্ছা আমাদের মনে যে কিরূপ ভাবে জাগরূক তাহা জ্ঞাপন করিতে আমি অত্যন্ত উৎসুক।

আমার ইহাও অভিলাষ ছিল যে, যাঁহারা ঐ পবিত্র অভিষেক-উৎসবে 'উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা যেন দিল্লীনগরীতে উহার স্মৃতি-উৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ হয়েন।

আমার পক্ষীয় শাসনকর্ত্তৃগণ, বিশ্বাসী কর্ম্মচারীবৃন্দ, নৃপতিবর্গ, ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এবং ভারত-সাম্রাজ্যের সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বিত এই জনসঙ্ঘ অবলোকন করিয়া সম্রাজ্ঞী এবং আমি আন্তরিক আনন্দলাভ করিয়াছি ও সুখী হইয়াছি।

রাজভক্তি প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা আমাকে যে সম্মান এবং রাজ-ভক্তির চিহ্নপ্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাহা আমরা স্বয়ং অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব।

এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্ষণে নৃপতিগণ এবং প্রজাবৃন্দের সহিত আমাকে যে সহানুভূতি এবং স্নেহসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে তাহা আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে।

এই জন্য কতকগুলি বিশেষ অনুগ্রহসূচক চিহ্ন দ্বারা আমার অভিষেক চিরস্মরণীয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি এবং এইগুলি এই দিবসের শেষভাগে আমার প্রধান শাসনকর্ত্তা দ্বারা এই সভায় ঘোষিত হইবে।

অবশেষে, আমার পূজনীয় পূর্ব্বাধিকারিগণ আপনাদের স্বত্ব ও বিশেষাধিকার রক্ষার যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে পুনরায় আশ্বাস দান করিতেছি। আপনাদিগের সুখ, শান্তি ও উন্নতি বর্দ্ধন করা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। ইহা পুনর্ব্বার উল্লেখ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি।

জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমার প্রজাদিগকে রক্ষা করুন এবং তাঁহাদের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে আমার ঐকান্তিক চেষ্টার সাহায্য করুন।

উপস্থিত নৃপতিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের প্রতি আমার স্নেহপূর্ণ অভিনন্দন জানাইতেছি।

* * * * * * * *

পূর্ব্বোক্ত দিল্লীদরবারের পরে, গত ১৯১২ সালে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী কলিকাতা আগমন করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা ছাত্রবৃন্দ এবং জনসাধারণের নিকট সমভাবে উপকারী।

অভিনন্দন এবং প্রত্যুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা নূতন দ্বারবঙ্গগৃহে—যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাদি সম্পাদিত হয়—মর্ম্মর প্রস্তরে স্বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মহামহিমান্বিত সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর প্রতি অভিনন্দন।

আমাদের উদার সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, গভীর শ্রদ্ধা এবং রাজভক্তি প্রণোদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ, আমরা সম্রাট দম্পতীকে অভিনন্দন করিতেছি। গত জুন মাসে লণ্ডনে যে রাজ্যাভিষেক সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন রাজধানীতে পুনর্ব্বার সম্পাদনেচ্ছায় এতদ্দেশে আগমন করিয়া আমাদিগের মহান্ সম্রাট এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাদিগের দেশের প্রতি যে গভীর স্নেহ এবং অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সকল ভারতবাসী সমভাবে কৃতজ্ঞ। ছয় বৎসর পূর্ব্বে, যুবরাজ অবস্থায় আপনি আমাদের সম্মান-সূচক "ডক্টর অব্ ল" (Doctor of Law) শ্রেণীভুক্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ, বিশেষ গৌরব ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে। আপনার মহিমান্বিত পিতৃদেব, প্রাতঃস্মরণীয় সপ্তম এডওয়ার্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এই প্রকার সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজবংশের সহিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা বংশপরম্পরাগত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হইয়া গৌরব জ্ঞান করিতেছি।

এই শুভ সময়ে আমরা কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হই নাই; বস্তুতঃ আমরা সকল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহাদের সংখ্যা দিন. দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহাদেরই প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছি। এবম্প্রকারে সমগ্র ভারতীয় শিক্ষিত জন সাধারণের পক্ষ হইয়া আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুমতি সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি। গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্কহেতু যে সকল অতুলনীয় সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ কৃতজ্ঞ, তাহা সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিতে আমরা অসমর্থ; এই দুইটী দেশের সম্মিলনে আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের যে সকল অমূল্য রত্নরাজি লাভে অধিকারী হইয়াছি—সে লাভের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারেন এবং ইহা তাঁহারা উল্লেখ করিতে বাধ্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরাকালে চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা গৌরব ও সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকি; কিন্তু, আমরা ইহাও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি যে, আমাদের দেশের সমৃদ্ধি এবং সুখবৃদ্ধি ও পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতি সমূহের মধ্যে সম্মানীয় স্থান পুনরধিকার করিতে হইলে, প্রথমতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কৌশলের অধিকারী হইতে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং, আমাদের মহিমান্বিত সম্রাটের—যিনি গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের সুখকর একতা এবং তজ্জনিত সকল সুখের প্রতিরূপ স্বরূপ—সম্মুখীন হইয়া, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ ধন্য, ভগবানের

বিধানে আমাদিগের ভাগ্যসূত্র গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় অত্যুন্নত এবং সভ্য-দেশের সহিত গ্রথিত করার জন্য জগদীশ্বরকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণ বহুপূর্ব্ব হইতে দূরদর্শিতা এবং সহানুভূতি সহকারে জ্ঞানদান ও শিক্ষাবিধানের প্রবর্ত্তন ও অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। তাহার জন্য আধুনিক জ্ঞানালোক দেশের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইতেছে; তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হইতেছি। এবং, এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটী কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। প্রতীতি জন্মাইবার জন্য আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে ভারতবর্ষের পুনর্গঠন সাহায্যে যে জ্ঞানোৎকর্ষের প্রয়োজন তাহার নেতা রূপে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গণ তাহাদের গুরুতর দায়িত্বের বিষয় অবগত আছে। তাহারা ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে তাহাদের কর্ত্তব্য কেবল বিদ্যা বৃদ্ধি ও বিস্তার নহে। দেশের শিক্ষা ও জ্ঞানমার্গের পথপ্রদর্শন ও উহাকে সুশাসনে রাখাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্র অকস্মাৎ বিস্তৃত হওয়ায় শান্তিপ্রিয়তা, সদাচার এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির প্রতি ভক্তি (যে সকল গুণাবলীর অবিরত নিঃশব্দে কার্য্য ব্যতীত কোন জাতিরই প্রকৃত মহত্ব ও উন্নতিলাভ হইতে পারে না) দুর্ব্বল না হয়, তাহাও তাহাদের সাধ্যানুযায়ী বিধান করা কর্ত্তব্য। আমরা সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে নিবেদন করিতেছি যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ অসীম জ্ঞান বিস্তারের নেতা হইবার উচ্চাভিলাষী হইলেও, যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্বের কেন্দ্র হইতে পারে তাহার প্রতিও লক্ষ্য আছে; এবং যে সকল বন্ধন ইংলণ্ড, রাজপরিবার এবং ভারতবর্ষকে একত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের দৃঢ়ীকরণও একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া

সদাসর্ব্বদা মনে আছে। জগৎব্যাপী ব্রিটীশ সাম্রাজ্য যে লোকহিতকর মহৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহার সিদ্ধিকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভে কিয়ৎ পরিমাণেও সাহায্য করিতে পারিবে, এইরূপ আশায় তাহারা বিশেষ উৎসাহানুভব করে।

মহামহিমান্বিত শ্রীশ্রীমান্ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তর।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাকে "ডক্টর অব্ ল" (Doctor of Law) সম্মানে ভূষিত করেন, সে ঘটনা আমি অদ্য অতিশয় আনন্দের সহিত স্মরণ করিতেছি, এবং ভারতের উচ্চশিক্ষার প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে তাহা প্রদর্শন করিবার অদ্য যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় লোকদিগের শিক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণের জন্য ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাহায্যের উপর আমি নির্ভর করি। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ উচ্চশিক্ষার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের ও শিক্ষার সম্মান-বৃদ্ধির জন্য সময় সময় যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেগুলির প্রতি আমি সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য রাখি। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। বিজ্ঞান এবং নানাবিধ কলাবিদ্যার উচ্চশিক্ষার ও অনুসন্ধিৎসুদিগের অধ্যয়নের সম্যক ব্যবস্থা না থাকিলে বর্ত্তমানকালে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্পূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আপনাদিগের পুরাতন শিক্ষা রক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিস্তার করিতে হইবে। চরিত্র গঠনের প্রতিও আপনাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ ইহার অভাবে শিক্ষা দ্বারা কোন হিতসাধনই সম্ভবপর নহে। আপনারা স্বীকার করিতেছেন যে আপনরা

নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে প্রস্তুত। আপনাদিগের সম্মুখে যে কার্য্য রহিয়াছে, ভগবান তাহাতে আপনাদিগকে সফলকাম করুন। আপনাদের আদর্শ উচ্চ হউক, ঐ আদর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিতে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করুন; ঈশ্বরানুগ্রহে আপনারা কৃতকার্য্য হইবেন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আমি সহানুভূতি সূচক বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলাম; অদ্য ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভারতবাসীদিগকে আমি আশার বাণী প্রদান করিতেছি। সর্ব্বত্রই নবজীবনের চিহ্ন এবং উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষাই আপনাদিগকে আশান্বিত করিয়াছে এবং উত্তম ও উচ্চতর শিক্ষা প্রভাবে আপনারা অধিকতর এবং মহত্তর আশায় উদ্দীপ্ত হইবেন। দিল্লী নগরীতে আমার আদেশক্রমে ঘোষিত হইয়াছে যে অমাত্যবর্গ সহ আমার প্রধান শাসনকর্ত্তা শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নতিকল্পে প্রচুর পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত করিবেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্কুল এবং কলেজ সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আমার অভিলাষ। শিল্পে, কৃষিকার্য্যে এবং জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী সকল ব্যবসায়েই আপনারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করণে সমর্থ হউন। রাজভক্ত, সৎসাহসী এবং কর্ম্মকুশল নাগরিকগণ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া জগতের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করুক। ইহাও আমার ইচ্ছা যে, আমার ভারতীয় প্রজা-সমূহের নিকেতন সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ থাকে, শিক্ষাপ্রভাবে পরিশ্রম তাহাদের নিকট মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারা সকলে মহৎভাবাপন্ন ও সুখী হয়, এবং স্বচ্ছন্দ ভোগ করে। শিক্ষা সাহায্যেই আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার কথা সর্ব্বদাই আমার অন্তঃকরণে উচ্চস্থান অধিকার করিবে।

আমার এবং আমার পরিবারবর্গের প্রতি আপনাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি, গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সখ্যতাসূত্র দৃঢ় করিবার অভিলাষ, এবং ইংরাজ রাজত্বের বিবিধ সুখ সম্ভোগের গুণ-গ্রহণ কথা আমার নিকট অতিশয় প্রীতিকর বোধ হইতেছে।

আপনাদিগের রাজভক্তি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পরিচায়ক অভিনন্দনের জন্য আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্ষণশীলতার কার্য্য

ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা—প্রাচ্য বিদ্যায় উৎসাহদান—স্বদেশজ বিধিব্যবস্থা ও চিরাচরিত আচার পদ্ধতির প্রতি সম্মান—ভূসম্পত্তি বিষয়ক স্থায়ী বন্দোবস্ত—প্রাচীন গ্রাম্য পুলিস—প্রাচীন ব্যবহার-দর্শনাধিকার প্রণালী—পঞ্চায়েত।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণীর ঘোষণাপত্র ভারতে সর্ব্ব জাতীয় লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও পূজোপাসনাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিঘোষিত করিতেছে। যাহাতে ভারতীয় লোকবৃন্দ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুসৃত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম বিশ্বাসাদি জন্য, শারীরিক, মানসিক সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অপমান প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়, এজন্য সভাধিষ্ঠিত রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরাল মহোদয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সনন্দ বিধির বলে ব্যবহার বিধির প্রবর্ত্তণে বাধ্য হইয়াছেন। সেই সনন্দ-আইনে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে, কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মজনিত পার্থক্য নিবন্ধন কোনও প্রকার রাজকীয় (সরকারি) পদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিধান দ্বারা, ধর্ম্মঘটিত যাবতীয় অত্যাচার ও অপমান হইতে লোক রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত বিধানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫ ধারা হইতে ২৯৮ ধারা পর্য্যন্ত সমস্ত বিধিতেই ধর্ম্ম ঘটিত অপরাধ সমূহের কথা বিবৃত আছে। মিষ্টার হুইট্‌লে ষ্টোকস্ (Mr. Whitley Stokes) বলেন, উক্ত ব্যবস্থা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বধর্ম্ম পালন করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইবে। কেহই পরধর্ম্মের প্রতি অপমান বা অত্যাচার করিতে পারিবে না। এই বিধানে যে সকল অপরাধের

উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই লোক প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের উপর যাদৃচ্ছিক অত্যাচার বিষয়ক *।

ভারতে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ;—প্রত্যেকেরই স্বধর্ম্ম অবলম্বন ও তদনুষ্ঠান পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। দ্বিতীয়তঃ,—কেহই তাহার ধর্ম্মমতের জন্য রাজকীয় পদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তৃতীয়তঃ,—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রেরিত অনুশাসন লিপি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুল বা কলেজে ধর্ম্মবিষয়ক কোনও পরীক্ষা বা শিক্ষা এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছে।+ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী ছাত্রগণের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দিতে নিষেধ করে। ভারতে ধর্ম্মবিষয়ে এই স্বাধীনতা দানের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে, ইহা স্মরণ করা উচিত যে, ইংরাজের স্বদেশ ইংলণ্ডেও ধর্ম্ম বিষয়ে এ স্বাধীনতারূপ মঙ্গলকর কার্য্যটী অতি অল্প দিনমাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক কাল নয়, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রোমান্ ক্যাথ্লিক্দিগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত "ক্যাথলিক্ রিলিফ্ এক্টের" শেষ বিধি (Last Catholic Relief Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহুদীদিগের "রিলিফ্ বিধি" ও ইহাদিগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন (Jewish Relief Act) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ হয় নাই। অন্যূন তিনশত বর্ষব্যাপী চেষ্টা ও আন্দোলনের পর ইংলণ্ড স্বয়ং ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা শাসনকর্ত্তৃগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত মহাদান, এবং এ দানটী বহু পূর্ব্বেই ভারতবাসী কর্ত্তৃক লব্ধ। শেষ "ক্যাথলিক্ রিলিফ্ বিধান," বিধিবদ্ধ হইবার মাত্র চারি বৎসর পরে কোম্পানির সম্বন্ধে বিধান (Charter Act)

---

* "এংলো-ইণ্ডিয়ান্ কোড," প্রথম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

+ "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থ খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা।

বিধিবদ্ধ হয়। যে বর্ষে ইহুদীদিগের "রিলিফ্ অ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ হয়, ঠিক্ সেই বর্ষেই মহারাণীর ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হয়।

লোকের চিন্তা, চরিত্র ও জীবন প্রণালী ভূয়িষ্ঠরূপে শিক্ষার উপর নির্ভর করে। প্রাচীন কাল হইতে, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বিদ্যালয় সমূহ হিন্দুগণের টোল চতুষ্পাঠী এবং মুসলমানগনের মাক্‌তাব্ ও মাদ্রাসা সমূহ * লোকশিক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটীস শাসনকর্ত্তারা এ সকল জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। কয়েক বৎসর হইতে মহানুভব ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে যথোচিত উৎসাহ দান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ বহু বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগ্রহণ, ছাত্রবৃত্তি দান এবং উপাধি প্রদানে শিক্ষকগণকে বেতন বা সাময়িক সাহায্য, পুরস্কারাদি দান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া, ঐ সকলের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ বিধান করিতেছেন। দেশের নানা স্থানে (সংস্কৃত, আরবি, ফার্‌সি প্রভৃতি) প্রাচ্যবিদ্যার চর্চ্চার জন্য স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ (Warren Hastings) কর্তৃক মুসলমানগণের শিক্ষার্থে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হিন্দুগণের শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থে হিন্দুজাতির ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সংরক্ষিত ও আলোচিত হয়। উক্ত কাশী কলেজে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক ভিন্ন আর সকল অধ্যাপকই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। উক্ত কলেজের নিয়মাবলীও সর্ব্বতোভাবে হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। †

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থ খণ্ড ৪০৭—৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"চার্টার আইনের" ১৮১৩ সালের একটী ধারায়* লিখিত আছে, ইংরাজাধিকৃত ভারতে স্বদেশীয় সাহিত্যাদি বিদ্যার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতির জন্য, বর্ষে বর্ষে এক লক্ষ টাকা রাজভাণ্ডারে পৃথক রাখা হইবে। ঐ অর্থ, ভারতীয় লুপ্তপ্রায় প্রাচীন শাস্ত্র সকলের পুনরুদ্ধার, গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এবং উহার দ্বারা সুযোগ্য পণ্ডিতগণকে সময়ে সময়ে যথোচিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদত্ত হইবে। (সংস্কৃত প্রভৃতি) প্রাচ্য বিদ্যা-শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজ সমূহের সংরক্ষণ, ছাত্রবৃত্তি দান, প্রাচ্য শাস্ত্র সমূহের উদ্ধার, সুযোগ্য পণ্ডিত দ্বারা উহার সংশোধন ও সুন্দররূপে উহার মুদ্রাঙ্কণ এবং বহুলরূপে প্রচার জন্যই প্রধানতঃ উক্ত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পুনায় একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের জন্যই বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, এবং উহাতে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাই অধ্যয়ন করিতে পাইত। কিন্তু সে নিয়ম এক্ষণে রহিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্ববর্ণের হিন্দু ছাত্রই এই কলেজে অবাধে অধ্যয়ন করিতে পারে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আগরা কলেজ ও ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দুই কলেজই সম্পূর্ণ প্রাচ্য (দেশীয়) ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে উহাতে ইংরাজি শিক্ষা প্রদত্ত হইত না। কিন্তু অচিরেই ইংরাজি শিক্ষাও প্রবর্ত্তিত হয়। কলেজের পাঠ্য মধ্যে ভূগোল-বিদ্যা ও অঙ্ক-বিদ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কলিকাতার ও আগরার সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি অধ্যাপনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দিল্লী ও কাশীতে ইংরাজি

---

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার" চতুর্থ খণ্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা।

শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র জিলা স্কুল সকল (District Schools) স্থাপিত হইয়াছে।*

যেরূপ শিক্ষা বিভাগে, সেইরূপ শাসনতন্ত্রেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল, যে, ভারতের চিরপ্রচলিত রীতি নীতি প্রভৃতি বিষয়ে, যতদূর সম্ভব হস্তক্ষেপ না করা হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কর্তৃক একটী ব্যবস্থা বিধি† প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে মফস্বলের ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে,—হিন্দুদের উত্তরাধিকার, বিবাহ, জাতি-বর্ণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়াদি ঘটিত যাবতীয় অভিযোগ, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে, এবং মুসলমানগণের ঐ সমস্ত অভিযোগ কোরাণের বিধানানুসারে, মীমাংসিত হইবে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের একটী ব্যবস্থা বিধিতে আরও উল্লিখিত আছে, যে, যে সকল বিষয়ে কোনও বিশেষরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় নাই, বিচারপতিরা সেই সকল স্থলে স্বকীয় ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও বিশুদ্ধ বিবেক বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া মীমাংসা করিবেন। ১৭৮১‡ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট নিরূপিত আইন-দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যে, কলিকাতাবাসিগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মামলা মোকদ্দমা মীমাংসা করিবার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের হস্তে প্রদত্ত হইল। কেবল উহার বর্জ্জিত বিধিতে উল্লেখ আছে, যে, ভূসম্পত্তি বিষয়ক উত্তরাধিকার, দায়াদ-ক্রম (inheritance and succession to lands), কর শুল্ক, দ্রব্যজাত, এবং নিয়ম পত্র (contract) প্রভৃতি ঘটিত সর্ব্বপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ, (বাদী প্রতিবাদী) উভয়পক্ষে মীমাংসা করিতে হইলে, মুসলমান পক্ষে, মুসলমান জাতির চিরাচরিত বিধি ব্যবস্থানুসারে, এবং হিন্দুপক্ষে হিন্দুজাতির চিরাচরিত বিধি ব্যবস্থানুসারে

* "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা।

† ২১শে অগষ্টের নিয়মাবলীর ২৩ ধারা।

‡ তৃতীয় জর্জ্জের ২১ আইন।

নিষ্পত্তি করা হইবে। যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ হিন্দু বা মুসলমান, সে স্থলে প্রতিবাদীর স্বজাতীয় বিধি ব্যবস্থানুসারেই মীমাংসা হইবে।

প্রাগুক্ত ব্যবস্থায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, * যে, "দেশীয় লোকগণের লৌকিক বা ধর্ম্ম ঘটিত আচার পদ্ধতি (civil and religious usages), অথবা পরিবারস্থ পিত্রাদিজনের বা অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্বত্ব ও প্রভুত্বাদি অধিকার, যাহা হিন্দুর ও মুসলমানাদির ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ পরিবার মধ্যে যথাবিধি সংরক্ষিত হইবে। তাঁহাদের স্বজাতীয় আচার ব্যবহার ঘটিত কার্য্য কলাপ ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধ হইলেও, অপরাধ মধ্যে গণ্য হইবে না।"

একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, ইংরাজাধিকৃত ভারতের ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে প্রবর্ত্তিত সমগ্র বিচার ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এবং ঐ সকল স্থানে যথাক্রমে পরিচালিত ইংলণ্ডীয় ও দেশীয় ব্যবস্থা পদ্ধতির প্রকৃতি ও পরিমাণ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ মহোদয়ের প্রখ্যাত নিয়মবিধির পালনে যদিও ভারতীয় ব্যবস্থাপকগণ (আইন প্রণেতারা) বাধ্য নহেন, তথাপি ঐ নিয়ম বিধিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেই সেই শ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, তাঁহারা ঐ সকলকে দেশের প্রাচীন আইন ও প্রথার অধিকারভুক্তই রাখিয়াছেন। পারিবারিক অধিকার, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকার ধারা প্রভৃতি বিষয়ক অধিকাংশ বিধানই অদ্যাপি ভারতবাসিগণের স্ব স্ব জাতীয় ব্যবস্থামতেই চলিয়া আসিতেছে। "এংলো-ইণ্ডিয়ান্" ব্যাবস্থাবিধি দ্বারা কোনও কোনও স্থলে আংশিক রূপান্তর বা সূত্রান্তর হইয়াছে মাত্র। হিন্দুজাতির বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, সংসৃষ্টি (একান্নভুক্ত পরিবার)

* অষ্টাদশ ধারা।

বিষয়-বিভাগ, দায়ভাগ, দায়াদক্রম প্রভৃতি, হিন্দুর প্রাচীন বিধানের অধিকারেই আছে। মুসলমান জাতিরও ঐ সকল বিষয় ও ধর্ম্মাদি ঘটিত দানাদির বিষয় তাঁহাদের প্রাচীন বিধানের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। *

ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়িণী ব্যবস্থা পদ্ধতি ইহার পর কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। এ স্থলে এই মাত্র বলা আবশ্যক, যে, এ সকল বিষয়েও যতদূর সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলতারই পরিচয় দিয়াছেন। বিখ্যাত ইতিহাস লেখক মহাত্মা বেডেন পাউএল্ † (B. H. Baden Powell) বলেন, ভারতে দেশীয় রাজতন্ত্রের ভগ্নদশার চরমকালের পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন তন্ত্র প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রথমতঃ অভিজ্ঞতার অভাবেই হউক, বা অন্যান্য কারণেই হউক তত্রত্য প্রচলিত শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন পক্ষে কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। ‡

বোম্বাই প্রদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মহারাট্টাগণ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত রায়তি প্রথা প্রচলিত ছিল এবং যদিও মাদ্রাজে এরূপ ছিল না তথাপি অনেকগুলি জিলায় ভূম্যধিকার প্রথা এরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল যে বাধ্য হইয়া উহাই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে নূতন নূতন আইন ও বিধি দ্বারা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাব ব্যতীত অন্যত্র পূর্ব্বতন প্রচলিত ভারতীয় প্রথাই ইংরাজ শাসনে মূলীভূত রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব ও খাজানা

---

* সার কোর্টনে ইলবার্টের "ভারত গবর্ণমেণ্ট" ৪০১ পৃষ্ঠা।

† বেডেন পাউএল কৃত "ভারতীয় খাজানা ও ভূম্যধিকার" ১১৪ পৃষ্ঠা।

‡ ১১৮ ও ১২৬ পৃষ্ঠা।

বিষয়ক বিশেষ প্রয়োজনীয় আইনে ইংরাজী ও ভারতীয় এই উভয় মতের বিরোধ ও মিলন দৃষ্ট হয়। *

ব্রিটিস্ শাসনের প্রথমাবস্থায়, গ্রাম্য পুলিসের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। উহা প্রাচীন প্রণালীর মূলে প্রতিষ্ঠিত। তৎকালে চৌকীদার বা মোড়লকে ত্যাগ করা কাহারও সম্ভব ছিল না। মোগল রাজশক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুলিস্ প্রণালী অধিকতর শোচনীয় ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারবর্গ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দণ্ড ভয় না করিয়া নিজ নিজ অনুচরবর্গকে প্রতিবেশিগণের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি-হরণে ও লুণ্ঠনে নিয়োজিত করিতেন। গ্রাম্য-মোড়ল ও পুলিস্, তাঁহাদের সেই অনর্থকর কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করায়, তৎকালে কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। ঐ সকল মোড়ল ও পুলিস প্রহরিগণের অধিকাংশই স্বয়ং চৌর দস্যুদলের অগ্রণী ছিল। উক্ত সামন্ত ও জমিদারগণ অপহৃত দ্রব্যের প্রধান ভাগ পাইতেন বলিয়া, চৌর ও দস্যুদলকে আশ্রয় ও উৎসাহ দান করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহারাই ঐ সকল মহাপাপের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যখন ইংরাজগণ প্রথম ভারতাধিকার করিলেন, তখন তাঁহারা এদেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করেন। তাঁহারা এদেশ সংস্করণের প্রথম উদ্যমেই জমিদারগণকে শান্তি রক্ষা কার্য্য হইতে অব্যাহতি দান করিয়া, সে ভার জিলার মাজিষ্ট্রেট-গণের হস্তে অর্পণ করিলেন। প্রত্যেক জেলা, ২০ বর্গ মাইল পরিসর লইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিস্ এলাকায় বিভক্ত হইল। এক একটী পুলিস এলাকা, বিংশ হইতে পঞ্চাশৎ সশস্ত্র প্রহরীর সহিত এক একটী দারোগার হস্তে অর্পিত হইল। † কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যে এ ব্যবস্থারও বিফলতা

* ইলবার্টের "ভারত গবর্ণমেণ্ট" ৪০ পৃষ্ঠা।

† "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থ খণ্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

প্রতিপন্ন হইল। তদবধি বরাবর পুলিসের সংস্করণ ও পুনর্গঠন চলিয়া আসিতেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থাপিত ভারতের আদিম ধর্ম্মাধিকরণ সমূহ, অধিকাংশ মুসলমান-শাসনতন্ত্রানুযায়িক উপাদানে গঠিত হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক একটী দেওয়ানি আদালত, প্রত্যেক প্রাদেশিক বিভাগে (Provincial division) কলেক্টরের অধীনে স্থাপিত হয়। কলেক্টর মহোদয় কোম্পানির পক্ষে দেওয়ানি আদালতে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। প্রত্যেক বিভাগে কাজি ও মুফ্‌তি * এবং দুইজন মৌলবী ফৌজদারী আদালতে উপবেশন পূর্ব্বক মুসলমান আইন মতে অপরাধের বিচার করিতেন। তাঁহাদের বিচার সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিত হইল কি না, তাহা দেখিবার ভার কলেক্টরের হস্তে ছিল। উক্ত দেওয়ানি আদালত হইতে সদর দেওয়ানি আদালতে আপীল করিবার অধিকার ছিল। একজন সভাপতি ও কতিপয় সদস্য দ্বারা উক্ত সদর দেওয়ানি আদালত গঠিত হইয়াছিল। খাল্‌সা বিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারীরা উহাদের সহায়তা করিতেন। ফৌজদারী আদালত হইতে আবার নিজামত আদালতে আপীল করিবার অধিকার ছিল। স্বয়ং নবাব নাজিম কর্ত্তৃক নিয়োজিত একজন সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণিক, প্রধান কাজি, মুফ্‌তি ও খ্যাতনামা তিন জন মৌলবী কর্ত্তৃক উক্ত নিজামত আদালত সংগঠিত ছিল। নিজামত আদালতের কার্য্য কলাপ, প্রধান সভাপতি ও তদীয় সভার তত্ত্বাবধানের অধীন ছিল।

পঞ্চায়ত প্রথাটী এ দেশের অতি প্রাচীন ব্যবস্থা। উহা বঙ্গ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের কোনও কোনও স্থলে রাজকীয় ব্যবস্থাধিকারে

---

* মুসলমান রাজধর্ম্মে, উত্তরাধিকার দায়ভাগাদি বিষয় বিচারের ভার কাজির উপর অর্পিত ছিল। মুফতিরা উকিলের ন্যায় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া কাজিকে বুঝাইতেন।

পরিগৃহীত। এই প্রথাটী গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন যন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। পঞ্চায়ত শব্দের যৌগিক অর্থ পাঁচ জনের সমবায়। ইহা প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি স্থানীয় প্রধান লোকের সভা; এই সভা প্রাচীন কাল হইতে পল্লীগ্রাম সমূহে প্রচলিত। ইহাতে সামাজিক বিবাদ এবং সময়ে সময়ে বৈষয়িক বিবাদেরও নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ প্রথা অধুনা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত নাই। উদার ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট এই উৎকৃষ্ট প্রথা তুলিয়া দিতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। যে উদ্দেশ্যে ও প্রথাবলম্বনে ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যদিও তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তথাপি যে যে স্থানে ইহা প্রচলিত, তথায় গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রকৃত উপযোগিতার সংরক্ষণেই চেষ্টা করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক উন্নতি

উন্নতিসাধনরূপে। পাশ্চাত্য ভাব ও বিদ্যালয় সমূহের প্রবর্ত্তন—ব্যবস্থাবিধি ও তাহার উদ্দেশ্য ও। উপযোগিতা—রাজবিধানে সর্ব্বত্র সমদর্শিতা—পৌরাধিকার—দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ—ধর্ম্মাধিকরণে প্রকাশ্য বিচার—ব্যবস্থাপক সভা ও ধর্ম্মাধিকরণ সমূহের কার্য্যাবলীর প্রকাশ্যভাব—সুবিচার পক্ষে সর্ব্বথা সতর্কতা—দণ্ডবিধি আইনে অভিযোগ সঙ্কুলতা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণোপায়—ধর্ম্মাধিকরণে স্বপক্ষ সমর্থন সুবিধা—বিনা বিচারে অপরাধ প্রমাণ বা দণ্ডাজ্ঞার নিষেধ—ও তাহার একমাত্র ব্যতিক্রমের স্থল—জুরির বিচার ও তাহার উপযোগিতা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র বিধি—ও ভারত গবর্ণমেন্টের শাসনতন্ত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ—স্থানীয় শাসনতন্ত্রের সহিত তাহার প্রভেদ—সাধারণের নিকট প্রথমে যথাবিধি উত্থাপন না করিয়া করস্থাপন নিষেধ—দেশীয় ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচন প্রথা—ও তাহার ক্রম বিস্তার—সাফল্যে দৃষ্টি রাখিয়া দেশোন্নতি—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য ও পরিপোষণ পদ্ধতি।

ভারতে ব্রিটীশ শাসনের প্রথমাবস্থা হইতে, ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা লোক-সাধারণের ইচ্ছা ও স্বার্থের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনার্থে তৎকাল প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার ও আচার অনুষ্ঠানের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন কল্পে কিরূপ যত্ন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শন করিতে যথোচিত চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতিই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এদেশে সমুন্নত পাশ্চাত্য ভাব ও পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক এবং সেই গুলিকে দেশীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া প্রচলিত করাই উচিত।

এজন্য কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন। তাঁহাদের ইহাই আন্তরিক বিশ্বাস, যে, উদার পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান বিধি প্রকৃত পক্ষে এদেশের উন্নতির সহায় হইবে, অর্থাৎ উহা দ্বারা ভারতবাসীর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক—সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সেই সঙ্গে লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইবে।

যে সকল সুপ্রণালীবদ্ধ বিধি পরম্পরা এদেশের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে সে সকল আধুনিক সমুন্নত ভাবে গঠিত। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই আইন সমূহ ধর্ম্মসংহিতা রূপে বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু ঐ সকল, সংহিতা রূপে বিদ্যমান থাকার একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, তাহাতে আইন সমূহ পরিষ্কৃত, সুনিশ্চিত, সুপ্রণালী বদ্ধ ভাবে প্রকটিত হয়, তাহা সমস্ত জগতে প্রচারিত হয় এবং ছাত্র, আইন ব্যবসায়ী, জজ, মাজিষ্ট্রেট্ ও সর্ব্ব সাধারণ লোকে, সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা বহুপূর্ব্বেই ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা-সংহিতা প্রণয়নের আবশ্যকতা স্থির করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ সালের "চার্টার একটের" (Charter Act) ৫৩ ধারায় (Section) উল্লিখিত আছে, কি য়ুরোপীয়, কি দেশীয়, সকলেই সমভাবে যাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং যাহা স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনাদির উপযোগী, এরূপ একটী সাধারণ বিচার প্রণালীর ব্যবস্থা উক্ত ভারতীয় রাজ্য সমূহে অনতিবিলম্বে সংস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। উহাতে এরূপ বিধান সমূহ বিধিবদ্ধ থাকিবে যাহা ঐ সকল রাজ্যের অধিবাসিমাত্রেরই প্রতি প্রযোজ্য। উহাতে লোকের স্ব স্ব অধিকার, হৃদয় ভাব, জাতি বর্ণাদি ভেদে লোকের বিশেষ বিশেষ সংস্কার ও আচার পদ্ধতি, লৌকিক বা সামাজিক প্রথা প্রভৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। অপিচ, উক্ত প্রদেশ সমূহে যে সকল আইন ও আচার রাজ বিধানের ন্যায় প্রবলভাবে

প্রচলিত, সে সকল পরিস্কৃত ভাবে ঐ সকল আইন পুস্তকে ব্যাখ্যাত ও দৃঢ়ীভূত হইবে। সময়ে সময়ে ঘটনানুরূপ প্রয়োজন মত সে গুলি সংশোধিত হইবে। উক্ত ব্যবস্থানুসারে স্বয়ং মন্ত্রি-সভাধিষ্টিত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের প্রতি আদেশ হয় যে, তিনি একটী কমিসন্ বসাইবেন। উহার নাম (Indian Law Commission) "ভারতীয় ব্যবস্থাপক কমিসন্" হইবে। বর্ত্তমান আইন ও সমগ্র বিচার পদ্ধতির বিষয় সুনিপুণ ভাবে অনুসন্ধান পূর্ব্বক তদ্বিবরণ তাঁহারা প্রকাশিত করিবেন এবং উক্ত বিবরণ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিতে হইবে। মেকলে সাহেব (Macaulay) এই প্রথম ইণ্ডিয়ান্ ল-কমিসনের অন্যতম সুবিখ্যাত সভ্য ছিলেন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য, যে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ইচ্ছানুসারে উক্ত বিশ্বজনীন, ভারতীয় বিচার প্রণালী ব্যবস্থার যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইবে, তাহাতে লোকের স্বত্বাধিকার, হৃদয়ভাব ও চিরাচরিত আচার পদ্ধতির বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপিচ, বর্ত্তমান আইন সকল যাহা লিপিবদ্ধ আছে, বা লিপিবদ্ধ না হইয়াও লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, সে সকলের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত ও নিঃসংশয় রূপে স্থিরীকৃত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজ বিধানের চক্ষে সর্ব্বলোক সমান। সকলেরই প্রতি সমদর্শিতা অসন্দিগ্ধ ভাষায় নিঃসংশয় ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কি য়ুরোপীয়, কি দেশীয়, ইংরাজাধিকারে মানব মাত্রেই একটী সার্ব্বভৌমিক দেওয়ানি ও ফৌজদারী ব্যবস্থা প্রণালীর পরতন্ত্র হইবে। তৃতীয়তঃ, এরূপ আইন সকল বিধিবদ্ধ হইবে, যাহা সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীমাত্রেরই প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। লোকোপজীব্য শ্রদ্ধেয় মহাত্মারা মুক্তকণ্ঠে এই সকল ব্যবস্থাপত্রের রচনা প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব স্যার্ ফ্রেড্রিক্ পোলোক

মহোদয় বলেন, এ পর্য্যন্ত যে দেশে যত ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রণালীই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে, ইংলণ্ডীয় আইনই ইহার মূল ভিত্তি। ইংলণ্ডীয় আইনে ও এ আইনে পার্থক্য এই যে, ভারতের জাতি-বর্ণাদিগত আচার বৈচিত্র, জল বায়ু, শিক্ষা দীক্ষা, স্থানীয় বিশেষত্ব, চরিত্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার অবস্থায় যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া, ইহা প্রণীত হইয়াছে। *

রাজবিধানে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, প্রজাগণের পক্ষে মহা কল্যাণকর। ইহার অর্থ এই যে, প্রজাগণ মধ্যে কেহই রাজার অনুগ্রহবিশেষের ভাজন নহেন। যিনি যাহার উপরই অত্যাচার করিবেন, তিনিই সমদর্শী রাজার অপক্ষপাত ন্যায়দণ্ডে তুল্যরূপে দণ্ডিত হইবেন। সকলেই অপক্ষপাত রাজ বিধানের রক্ষাধীন। সকলেই অভিন্ন প্রজাস্বত্বের (Rights of Citizenship) তুল্যাধিকারী। ভারতে দেওয়ানি আইন (Civil Law) সকলের পক্ষেই অভিন্ন। প্রাচীন রোমে যেমন জেতৃপক্ষে একরূপ ও বিজিত পক্ষে অন্যরূপ রাজ বিধান প্রচলিত ছিল, ভারতে ইংরেজাধিকারে সে পার্থক্য নাই। সকলেরই এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে. রাজ বিধানে ঈদৃশ বিশ্বজনীন সমদর্শিতা ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণেরই সৃষ্ট। রাজ বিধানে এই সমদর্শিতা, ১৮৩৩ সালের "চার্টার এক্টে" (the Charter Act of 1833) কীর্ত্তিত এবং ১৮৫৮ সালের মহারাণীর সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা-পত্রে সুগম্ভীর ও সুদৃঢ় ভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে।

ফৌজদারী বিধান (Criminal Law) বিষয়ে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, দণ্ড বিধি আইনে ইহা এরূপ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, যে ভারতে কি ইংরাজ, কি দেশীয় ব্রিটীশ প্রজা সকলেই, ১৮৬২ সালের ১লা

---

* "এংলো ইণ্ডিয়ান কোড" প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, ২৬ পৃষ্ঠা।

জানুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া এই আইনের নিয়মভঙ্গাপরাধে তুল্যরূপে দণ্ডনীয় হইবে।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণই এতদ্দেশে স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংরাজ এ দেশ হইতে দাসত্ব প্রথা উন্মুলিত করিয়া, সর্ব্বত্র সাম্য ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজবিধি জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই ন্যায়ানুগত, অপক্ষপাত তুল্যাধিকার দান করিয়াছে। সকলের গার্হস্থ্য বা সামাজিক পরস্পর সম্বন্ধ, দম্পতির পরস্পর সম্বন্ধ, পিতা পুত্র সম্বন্ধ, প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ, জমিদার প্রজা সম্বন্ধ, রাজবৃন্দের সহিত তদীয় প্রজাবর্গের সম্বন্ধ, প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বত্র সকলে, ইংরাজ প্রবর্ত্তিত রাজ বিধানে তুল্যাধিকার উপভোগ করিতেছেন। ইংরাজ শাসন তন্ত্র নীতির ইহাই সর্ব্বজন স্বীকৃত মূল তত্ত্ব যে, ইংরাজ রাজবিধান ব্যক্তি বিশেষের সম্মান করে না।

ধর্ম্মাধিকরণে বিচার কার্য্য সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবেই সম্পাদিত হয়। ইহা শুধু অভিযোগ উপস্থিত করণার্থেই নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে কোনও অভিযোগের বিচার প্রণালী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিবার জন্যও বটে। যদিও, তত্রত্য প্রধান রাজকর্ম্মচারী ধর্ম্মাধিকরণ-মধ্যে বিচার কার্য্যের হানিকর অতিজনতা বা বিশৃঙ্খলতাদি নিবারণের উপায় বিধান করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে, যে কোন ব্যক্তিরই ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশাধিকার ও বিচার প্রণালীর শ্রবণাধিকার আছে। বিচার কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া স্বয়ং তাহা বিচার করিবার সুবিধা সকলকেই প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মাধিকরণ ও ব্যবস্থাপক সভা সমূহের কার্য্য বিবরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, এক সময়ে কোনও কোনও শ্রেণীর অভিযোগ বিচারে, ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্যাবলী গোপনীয় ছিল; পার্লিয়ামেণ্ট

মহাসভায় উভয় পক্ষের বাদানুবাদ বিবরণ প্রচার করিবার স্বাধীনতা টুকু, দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ ও কঠোর প্রয়াস পরম্পরার পর ১৭৭১ সনে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবাদের এক পক্ষে মুদ্রাযন্ত্র ও ম্যাজিষ্ট্রেট-শক্তি, এবং অন্য পক্ষে সাধারণ সভা (House of Commons) ছিল।

ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ সমূহ আইনানুসারেই এবং নিরপেক্ষতা ও দেশাচার অনুযায়ী মীমাংসিত হইবার নিয়ম। জজের নিজের বিবেচনায় বা স্বেচ্ছাক্রমে মীমাংসা করিবার নিয়ম নাই। ন্যায় বিচারার্থী মাত্রেই ধর্ম্মাধিকরণের বিচার যন্ত্র পরিচালনে সমর্থ। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষে, (এবং সমর্থ না হইলে স্বয়ং) উকিল, কৌন্‌সিলি দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন। বিচারপতি উভয় পক্ষীয় ব্যবহারা-জীবের সম্পূর্ণ বক্তব্য না শুনিয়া কোনও অভিযোগের মীমাংসা করিতে পারেন না। আইনের বিধানানুরূপ প্রকৃতি ও অবস্থা-নুসারে সাক্ষ্য সাবুদ প্রকাশ্য ভাবেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। বাদী ও প্রতিবাদী প্রত্যেক পক্ষই পরস্পরের সাক্ষ্যের সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য পরস্পরকে জেরা করিতে পারেন। ফৌজদারী মামলায় অপরাধীর প্রতিকূলে কোনও সাক্ষ্যই তাহার অনুপস্থিতিতে গৃহীত হয় না। সকল মোকদ্দমায় দৃঢ় ভাবে সত্য কথন ও স্বীকার বা শপথ পূর্ব্বক, সাক্ষ্য-দাতাকে সাক্ষ্য দিতে হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, তাহার দণ্ড অতি গুরুতর। কতকগুলি ঘটনায় সাক্ষ্য দানে অস্বীকার করা একটী অপরাধ। এক কথায় বলিতে গেলে, ধর্ম্মাধিকরণের প্রত্যেক বিচারে, প্রকৃত ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক, সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত, অপক্ষপাত বিচার পক্ষে সর্ব্ব প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

কোনও অপরাধীর বিচারে, তাহার সেই বিশেষ অপরাধ বিষয়ে, তাহার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি উপস্থিত করা হয়, তাহার সম্বন্ধে

তদ্দারাই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ করিতে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি প্রদান অভিযোক্তারই করণীয়। যদি সেরূপ কোনও সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থিত করা না হয়, তবে সে অপরাধী অব্যাহতি লাভ করে। ফ্রান্স দেশে প্রচলিত অতি পরীক্ষণশীল (inquisitorial procedure) বিধির অনুসারে, অপরাধ জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির গূঢ় চরিত্র এবং তাহার পূর্ব্বঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয়। সেই অনুসন্ধানে যদি তাহার চরিত্রে ও পূর্ব্ব বিবরণে এরূপ কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয়, যে, তাদৃশ অপরাধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে, তবে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণার্থে তাহাকে আহ্বান করা হয়। যদি সে আপন নির্দ্দোষিতার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারে, তবে সে অপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত ও দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে, এই শেষোক্ত বিচার পদ্ধতি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় অসুবিধা জনক।

কোনও দেশের ফৌজদারী আইন, সেই দেশের অধিবাসিগণের উপভোগ্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা। ইংরাজের ব্যবস্থা প্রণালীতে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংরক্ষণের পক্ষে এরূপ সুবিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে, যে, তদ্দারা কাহারও স্বাধীনতা অকারণে বা অন্যায়রূপে বিপন্ন হইতে পারে না। যে স্থলে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করিয়াছে, অথবা সে অপরাধী বলিয়া ধারণা হইয়াছে, সে স্থলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। যে পক্ষ তাহার অপরাধ বিষয়ে সংবাদ দান করে, বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে, যদি তাহার সে সংবাদ বা অভিযোগ, শেষে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে সেই সংবাদদাতা বা অভিযোক্তা রাজবিধানে দণ্ডনীয়। যাহার বিরুদ্ধে ঐরূপ সংবাদ প্রদত্ত হয় বা অভিযোগ উপস্থিত করা হয়,

তাহাকে বিচারার্থে আদালতে উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ ভিন্ন অন্য স্থলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ভিন্ন কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার বিধি নাই। বিচার কালে অপরাধী ব্যক্তির, কৌন্সিলি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। এবং যাবৎ বিচারপতি তাহার স্বপক্ষ-সমর্থন শ্রবণ না করেন, তাবৎ সে অপরাধী বলিয়া গণনীয় বা দণ্ডনীয় হয় না। যাবৎ তাহার অপরাধ সপ্রমাণ না হয়, তাবৎ তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই গণনা করিবার বিধি। সাক্ষীর ন্যায় তাহাকে পরীক্ষা বা জেরা করা হইবে না। আত্মবিষয়ে তাহার বক্তব্য-কথা বিবৃত করিতে ও আত্মরক্ষার্থে প্রমাণ প্রদান করিতে তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। অভিযুক্ত অপরাধীর পক্ষে এসকল সুবিধা সামান্য নহে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা আর কিছুই হইতে পারে না। ইংরাজ বিচার পদ্ধতির কয়েকটী অনন্যসাধারণ গুণ আছে। উহার নিকট ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা বিশেষ আদৃত। ইংরাজ কর্ত্তৃক এদেশে প্রবর্ত্তিত এ সকল সুবিধার অনেক গুলি তাঁহাদের স্বদেশের ইতিহাসে অল্প দিন হইল স্থান পাইয়াছে। ইংলণ্ডের ফৌজদারী আইন (যাহা এক্ষণেও ভারতবর্ষের ন্যায় নিবদ্ধ হয় নাই) ইদানীং যতদূর পরিশুদ্ধ ও উদার ভাবে গঠিত পূর্ব্বে সচরাচর ততদূর ছিল না। বরঞ্চ, তথায় এমন এক সময় ছিল, যে সময় উহা অভিযুক্ত কয়েদিগণের পক্ষে অতিমাত্র অন্যায্য ছিল। "দায়িত্বশূন্য শাসন তন্ত্রের গভীরতম কলঙ্ক, উহার ফৌজদারী আইনের ইতিহাসেই পরিলক্ষিত হয়। দুর্লভ মানবজীবনকে যদৃচ্ছাক্রমে অতীব নিষ্ঠুর ভাবে বিনষ্ট করা, প্রাচ্য, স্বেচ্ছাচারী, প্রজাপীড়ক, নৃশংস রাজগণের, অথবা আফ্রিকাবাসী অধিপতিগণের কার্য্য। উহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজতন্ত্রের কার্য্য নহে।*" ইংলণ্ডে বহু বর্ষব্যাপী

* মে প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

বাদানুবাদের পর, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, অপরাধী কয়েদিগণের ঘোরতর পাপের বিচারে, অপরাধিপক্ষে কৌন্সিলি নিয়োগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কোনও বিশেষ ঘটনা স্থলে বিনা বিচারেও, কোনও ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। যে সকল ঘটনায় এরূপ করা যায়, সে সকল বিষয় ১৮১৮ সালের তৃতীয় বিধানে (Regulation III, 1818) সবিশেষ বিবৃত আছে। রাজতন্ত্র ঘটিত কোনও বিশেষ ঘটনায় বা কারণে, মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরাল মহোদয় এরূপ গ্রেপ্তারি আদেশ পত্র বাহির (ওয়ারেণ্ট জারি) করিতে পারেন। যাহার বিরুদ্ধে আদালতে আইন মত কোনও অভিযোগ আনিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই, তদ্দারা, এরূপ ব্যক্তিকেও কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। যাহাকে ঐরূপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হয় না। তাহাকে সেই অবরুদ্ধাবস্থায় কোনও পরিশ্রম করিতে হয় না। এইরূপ রাজকীয় কয়েদির স্বাস্থ্য ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য যথোচিত যত্ন করা হয়। তাহার নিজের ও তদীয় পরিবারবর্গের সামাজিক পদমর্য্যাদানুরূপ ভরণ পোষণাদির ও অন্যান্য অভাব নিরাকরণের যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে জুরি দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল অপরাধীর হাইকোর্টে বিচার হয়, তাহাদের বিচার জজ ও জুরি, উভয় দ্বারা সম্পাদিত হয়। বিচারক জজ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও জুরীগণ একমত হইলে তাঁহাদিগের মতই গ্রহণীয় হইয়া থাকে। সেসন্ আদালতের বিচারে অভিযুক্তেরা জজ দ্বারা বিচারিত হয়, জুরি বা এসেসরেরা জজের সাহায্য করেন। কোন্ স্থলে জুরির সাহায্যে বিচার হইবে, কোন্ স্থলেই বা এসেসরের সাহায্যে বিচার হইবে, এ বিষয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা

নির্দ্দেশ করিয়া দেন। যে কোনও জুরি বিচারে, আইন ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসার ভার জজের হস্তে; ঘটনা বিষয়ক তথ্য নিরূপণের ভার জুরির হস্তে। মোকদ্দমা শ্রবণ শেষ হইলে, জজ মহোদয়, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির সারাংশ সঙ্কলন পূর্ব্বক, জুরিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি ঐ অভিযোগে প্রযোজ্য আইনের ধারা সকল বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদের মীমাংসার ভিত্তিস্বরূপ প্রকৃত ঘটনা বিষয়ক প্রশ্ন সকল উপস্থিত করেন। এ জুরি বিচার প্রণালী ইংলণ্ডে একটী বহুমূল্য প্রজাস্বত্ব, এবং তথায় এ প্রণালী বহু কালাবধি প্রচলিত আছে। ইহা ভারতে ইংরাজ প্রদত্ত একটী বহুমূল্য অধিকার। ইহাতে অভিযুক্তের পক্ষে একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রকৃত ঘটনা বিষয়ক প্রশ্ন সকল, ব্যবহারাজীবের শুধু পারিভাষিক আইনের তর্ক দ্বারা মীমাংসিত না হইয়া, সাধারণের প্রশান্ত, সহজ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা মীমাংসিত হয়। ইহা দ্বারা অন্যতর বিশেষ সুবিধা এই যে, ঘটনা বিষয়ক প্রশ্ন সকল জুরির সম্পূর্ণ স্বাধীন বিবেচনা দ্বারা নির্ণীত হয়। ইহা ধর্ম্মাধিকরণের আধিকারিক ভাব (Official Point of View) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জুরি-বিচার পদ্ধতিকে প্রকৃত রূপে সুফলে পরিণত করিতে হইলে, যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সুশিক্ষিত, স্বাধীনচেতা ও সচ্চরিত্র, এরূপ সুযোগ্য লোক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক জুরির কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা এদেশের রাজনৈতিক উন্নতি লাভের জন্য কেবল পাশ্চাত্য জাতির সমুন্নত ভাব সকলের অনুরূপ রাজবিধি প্রণয়ন ও সে সকলের সম্যক্ পরিচালন-যন্ত্রের দিকেই দৃষ্টি রাখেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় শাসনতন্ত্রের অর্থ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন দ্বারা ও রাজনৈতিক সমুন্নতির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র। যে দেশ স্বাধীন, সে দেশকে স্বায়ত্ত

শাসনাধীন বলা যায়। পক্ষান্তরে যে দেশ স্বায়ত্ত শাসনাধীন, সে দেশকে স্বাধীন বলা যায়। স্বায়ত্তশাসন ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন তন্ত্রের অধীন হইলেও, ইহার অনেক গুলি বা সমস্ত স্থানীয় কার্য্য কলাপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা পরিচালিত হয়। এই স্বায়ত্ত শাসন তন্ত্র সম্রাট্-তন্ত্রের সৃষ্ট। ইহা ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন তন্ত্রের ইচ্ছায় পরিবর্ত্তিত বা উন্মূলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, এই স্বায়ত্ত শাসনের প্রায় সকল স্থলেই, পর্য্যবেক্ষণের ও সাধারণ কর্ত্তৃত্বের কতক ক্ষমতা উর্দ্ধতন গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন। মিউনিসিপাল বিষয় সমূহ সম্বন্ধে, কলিকাতায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত, এ কথা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সমূহ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত না হইয়া, "কলিকাতা কর্পোরেসন্" নামক সভা দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এই কর্পোরেসন্ সভা প্রধানতঃ কলিকাতা মহানগরীর করদাতৃগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ লইয়া সংগঠিত হয়। কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট, মনোনীত কমিশনার এবং মনোনীত সভাপতি এবং আইন দ্বারা কর্পোরেসন্ সভাকে দমনে রাখেন।

ভারতের স্থানীয় শাসন তন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। এ স্থলে "Local Self Government" বা স্বায়ত্ত শাসন তন্ত্র এই বাক্যটীর প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, এবং এই স্থানীয় শাসন তন্ত্রের উদ্দেশ্য গুলিও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় শাসন তন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন তন্ত্র (Local Government and Local Self-Government) এ উভয় একার্থ বাচক নহে। প্রথমটীতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা কোনও সাম্রাজ্যের বা দেশাংশের শাসন প্রণালী এবং কথনও কথনও ইহা দ্বারা তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব শক্তিকেও বুঝায়। যে স্থলে সেই স্থানীয় কর্ত্তৃত্ব সাধারণের আদৃত বা সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ

(representation), সে স্থলে, স্থানীয় শাসন তন্ত্রটী, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন তন্ত্রে পরিণত হয়। বঙ্গের শাসন তন্ত্রকে স্থানীয় শাসন তন্ত্র বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে ও অনেকটা স্বাধীন ভাবে বঙ্গ দেশকে শাসন করিতেছে। কিন্তু যে প্রভুশক্তি ঐ সকল প্রদেশকে শাসন করিতেছে, তাহা আধিকারিক (official) এবং কার্য্য নির্ব্বাহক (executive) এবং উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিয়োজিত। অতএব, বঙ্গের শাসন তন্ত্র, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের দৃষ্টান্ত নহে। যদিও সভাপতি এবং কয়েক জন সদস্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, তথাপি কলিকাতার কর্পোরেসন্‌কে স্বায়ত্ত শাসনকারী বলা যায়, কারণ উহা ভূয়িষ্ঠ রূপে করদাতৃগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত।

কর স্থাপন ও সাধারণ কার্য্যে অর্থব্যয়ের নিয়ম প্রণালী, এ দুইটা, গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনীয় কার্য্য। স্থানীয় কর স্থাপন এবং উহার দ্বারা সংগৃহীত অর্থ স্থানীয় প্রয়োজনেই সামান্য নিয়মাধীনে থাকিয়া ব্যয় করিবার ক্ষমতা, এ দুটী বিষয় স্বায়ত্ত শাসন তন্ত্রের প্রধান। প্রজা সাধারণের প্রতিনিধিগণই করস্থাপনের প্রকৃত অধিকারী, এ তত্ত্বের উপযোগিতা ইংলণ্ড বহুকালাবধি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ইংলণ্ডবাসীর মনের ভাব এই যে, যে দেশে প্রজা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভিন্ন অন্যে কর স্থাপন করিতে পারে, তথায় প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই। যাহা হউক, এ স্থলে ইহা মনে রাখা উচিত, যে, এই তত্ত্বটী প্রাচীন কালে বা বর্ত্তমান কালে সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য রূপে পরিগৃহীত হয় নাই। এজন্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা প্রজা স্বাধীনতার এই মূল তত্ত্বটী ছাড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন মার্গে প্রবৃত্ত।

হিন্দু বা মুসলমান রাজত্বে এ তত্ত্বটী বিশেষরূপে চিন্তা করা হয় নাই এবং ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণ স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধেও ইহা বিশেষ কড়াকড়ি

ভাবে প্রয়োগ করেন নাই। উচ্চতর স্বায়ত্তশাসন বিভাগে তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত কতকগুলি কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। এই ব্যক্তিগণ যদিও মতে ও স্বার্থে কতকগুলি সমাজের প্রতিনিধির ন্যায় থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রকৃত প্রতিনিধি পদ বাচ্য নহেন।

প্রাচীন কালের ভারতীয় শাসন তন্ত্রে যদিও একপ্রকার স্থানীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা একপ্রকার যৎসামান্য গ্রাম্যভাবে অনুষ্ঠিত হইত। তৎকালে গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ স্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত। গ্রাম্য পুলিস স্থানীয় লোক দ্বারা গঠিত ও স্থানীয় লোকের শাসনাধীন ছিল। পঞ্চায়তেরাই সামাজিক ও আইন ঘটিত বিবাদ বিসংবাদের নিষ্পত্তি করিতেন। ঐ সকল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন সম্প্রদায় যে কোনও বিধিবদ্ধ নির্ব্বাচন প্রণালী দ্বারা সংগঠিত হইত, অথবা প্রজার প্রতিনিধি দ্বারা অগ্রে স্থিরীকৃত না হইলে, কোনও কর স্থাপন হইতে পারে না, এরূপ কোনও যুক্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ভারতে ইংরাজশাসক-গণের প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী, বিশেষতঃ লর্ড রিপণের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত উক্ত প্রণালী, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন (গ্রাম্য) প্রণালী অপেক্ষা প্রশস্তায়তন ও নিয়মানুগত। প্রতিনিধি ব্যতীত রাজকর গৃহীত হইতে পারে না, এরূপ কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা প্রকৃত কার্য্যোপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গঠিত। ইহার সাধনীয় উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমতঃ স্থানীয় বিষয় গুলি এরূপ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যথোচিত নির্ব্বাহিত হইবে, যাঁহারা সে সকল স্থানের সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপে উচ্চতর রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের গুরুতর কার্য্যভারের কতকটা লাঘব করা। তৃতীয়তঃ,

ইহা দ্বারা প্রজাগণ ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্রে কৌশলে সুশিক্ষিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য কয়টীর শেষোক্তটীতে স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীরা, নির্ব্বাচিত প্রজাপ্রতিনিধিগণের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। এই সমগ্র প্রণালীটী পরীক্ষণীয় অবস্থায় অবস্থিত, এবং ইহার সফলতানুসারে ক্রমশঃ ইহার পরিসর ও পরিপুষ্টি পরিবর্দ্ধিত হইবে। অর্থাৎ ইহার মৌলিক অঙ্গগুলির পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। তদ্ভিন্ন, এ নির্ব্বাচন তন্ত্রের মর্য্যাদা দিন দিন অধিকতর লোকমণ্ডলীর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা,—কলিকাতার ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী "ফেলো পদ" (Fellowships of the Calcutta University) এই নির্ব্বাচনপ্রণালীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের অথবা মিউনিসিপাল কর্পো-রেসনের এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্যের কমিটী সমূহ এই নির্ব্বাচন প্রণালী দ্বারাই সংগঠিত হয়। সাধারণ জনমণ্ডলীর কতকগুলি ব্যক্তি, স্থানীয় সমিতির (Local Councils) সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। ঐ নির্ব্বাচিত সভ্যেরা ভাইস্‌রয়ের কৌন্সিলের (Viceregal Council) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত এই দৃষ্টান্তে, প্রজাগণ, যে যে বিষয়ে এই নির্ব্বাচন-রীতি প্রযোজ্য, সেই সেই স্থলে ক্রমেই বহুলরূপে ইহার প্রয়োগে অগ্রসর হইতেছেন।

মৌলিক প্রকৃতি, নির্ব্বাচনোৎপাদনের শক্তি ও পরিমাণ এবং ঊর্দ্ধতন রাজশক্তির হস্তগত পর্য্যবেক্ষণ ও শাসনের অধিকার, ইত্যাদি ভেদে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সকল বিভিন্ন। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (Central or Centralised government) কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্রের বিপরীত।* বর্ত্তমান

---

* সর্ব্বকেন্দ্রীভূত, সর্ব্বপ্রধান প্রভুশক্তির হস্তস্থিত দেশের আভ্যন্তরিক শাসন-ভারকে বহুসংখ্যক স্থানমধ্যে বহুধা বিভাগ করিয়া দেওয়া।

শাসনকর্ত্তৃগণের শাসননীতি এই যে,—শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রচ্যুত করা, অথবা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্রকে অধিকতর প্রসারিত করা। কিন্তু, যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি এ বিষয়েও কোনও একটা মনঃকল্পিতভাব দ্বারা চালিত না হইয়া, তাঁহারা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া, সাবধানে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মিঃ সি. ই. এইচ. হবহাউসের কর্তৃত্বাধীনে যে "বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা এই বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন এবং এই সকল পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শীঘ্রই আইন প্রণয়ন হইবে।

স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র সকল, স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষুদ্র হইতে ক্রমশঃ মহত্তর আয়তনে পরিণত হইয়া থাকে, এবং ইহাদের কর্ম্মশক্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে ক্রমশঃ বৃহত্তর পরিসরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। উদার ব্রিটীশ গবর্ণমেন্ট অগ্রে স্বল্প পরিসরে এই স্বায়ত্ব শাসনের সফলতা দর্শন করিলে, ইহার আয়তন ক্রমেই বর্দ্ধিত করিবেন। অতএব স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী, প্রজাবৃন্দের যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিল। গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্ব্বেই ইহার অধিকতর পরিপুষ্টি সাধনের অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ কল্যাণটী যথাযোগ্য কালেই সাধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। শুধু এই কথাটী মনে রাখা উচিত যে, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ক্রমে যতই পরিপুষ্ট হউক না কেন, ইহা সর্ব্বদাই ইহার স্থানীয় প্রকৃতিকে রক্ষা করিবে। রাষ্ট্রগত স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ,—জাতীয় স্বাধীনতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ

অশ্লীল, নীতি বিগর্হিত, দণ্ডনীয় কদাচার নিবারণ—সতীদাহপ্রথার ইতিবৃত্ত—উহার নিরাকরণেতিহাস—বানফোঁড়া—(চড়কে) পিঠফোঁড়া ও ঐ সকলের নিরাকরণেতিহাস—সামাজিক দোষ গুলির প্রতি গবর্ণমেণ্টের ভাব—শিশুহত্যা—কদাচার—বিধবা-বিবাহ—পরধর্ম্মদীক্ষিতের পৈতৃক ধনাধিকারে বাধা নিবারণ—স্ত্রীশিক্ষা—অশ্লীল ও নীতি বিদ্বিষ্ট কদাচার নিবারণ বিষয়ে রাজবিধান।

সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মঘটিত বা সামাজিকপ্রথা গুলি, ব্রিটীশ শাসনে যথোচিত সম্মানিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া, যে সকল আচার অশ্লীল, নীতি বিদ্বিষ্ট এবং দণ্ডনীতি দ্বারা অবশ্য দণ্ডনীয়, সে সকল কদাচার কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। যদ্দ্বারা লোকের প্রাণ-সংহার অথবা শারীরিক বা বৈষয়িক অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সে সকলকে রাজবিধানে দণ্ডনীয় বলা যায়। যখনি এদেশের কোনও চিরপ্রচলিত আচার পদ্ধতির উন্মূলন একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে শাসনকর্ত্তারা তৎপক্ষে অতীব সাবধানে অগ্রসর হইয়াছেন। যে সমাজের ঐ সকল বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সেই সমাজের মতামতের উপর যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ সকল সংস্কার কার্য্যের জন্য তাঁহারা প্রথমে সেই সমাজকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন, অথবা তদ্বিষয়ে অতি মৃদুভাবে কার্য্য করিয়াছেন—অনন্তর তাঁহারা পূর্ণ সংস্কারের ভার সেই সমাজের হস্তেই অর্পণ করিয়াছেন। যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সতর্কতা লোক-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, এবং যথায় গবর্ণমেণ্টের মৃদু উপায় সকল

বিফলীকৃত হইয়াছে, এবং যথায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে লোক-সমাজ অক্ষম বা অনিচ্ছুক, কেবল সেই সেই স্থলেই গবর্ণমেণ্টের শাসন শক্তি ব্যবস্থাপক বা কার্য্যনির্ব্বাহক বিধান দ্বারা সেই সকল অনিষ্টের উন্মূলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টকৃত সমাজ সংস্করণের একটী জাজ্জল্যমাণ দৃষ্টান্ত,—হিন্দু-জাতির সতীদাহ নিবারণ।

'সতী' শব্দের প্রকৃতার্থ,—পতিব্রতা বা ধর্ম্মশীলা নারী। 'সতী' হওয়া মর্ম্মে আপন মৃতপতির চিতারোহণ পূর্ব্বক তদীয় মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে পত্নীর নিজদেহের ভস্মীকরণ। এই প্রথার মূল স্রোত অজ্ঞাত। শাস্ত্রানুযায়ী সতী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন অথবা পতির সহগামিনী হইতে পারেন। যদি সহমরণে বিধবার কোনও পুণ্য থাকে, তবে সে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত সহগমনে হইত। কিন্তু, কালক্রমে এই প্রথা বিধবাগণকে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিতে লাগিল। যে শোক-কাতরা বিধবার বিচার করিবার সামর্থ্য অথবা অস্বীকার করিবার সাহস থাকিত না, অনেক সময় তাঁহাকে সহমৃতা হইবার জন্য প্ররোচিতা করা হইত। কথিত হয় যে, কোন কোন সময়ে ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করা হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে, তখন আর গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লির শাসনকালে, তিনি আপীল আদালতের জজদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সতীদাহ প্রথা হিন্দুজাতির কি পরিমাণে ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্টিত? যদি ইহা তাহাদের কোনও অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মশাস্ত্র শাসনের মূলে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে গবর্ণর জেনেরাল আশা করেন, ইহা অবিলম্বে না হউক, ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে

উঠিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, যদি উক্ত আদালত এই প্রথার উন্মূলনকে হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসের হানিকর বা অসম্ভব বলিয়া বোধ করেন, তবে ঐ আদালতের এরূপ উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে উক্ত কার্য্যে বুদ্ধি ভ্রংশকর দ্রব্য প্রয়োগ, বা বালিকা বিধবার সে কার্য্যে প্রবর্ত্তনা প্রভৃতি বিসদৃশ উপায় গুলি (তদীয় স্বার্থপর আত্মীয় কর্ত্তৃক) অবলম্বিত না হয়।” গবর্ণরের আজ্ঞায়, উক্ত জজেরা দেশীয় পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হিন্দু বিধবারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এরূপ 'সতী' হইবার অধিকারিণী কি না? তদুত্তরে পণ্ডিতেরা বলিলেন,—কতকগুলি বিশেষ স্থল ভিন্ন, হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণের প্রত্যেক নারীই স্বেচ্ছায় সতী হইতে পারে। অনন্তর জজেরা গবর্ণমেণ্টের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, যদিও আমরা আশা করি, অচিরে এ প্রথা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইবে, তথাপি ইহার অবিলম্বে বিলোপ সাধনের চেষ্টা উচিত হইবে না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এরূপ রাজবিধি প্রণয়নে পরামর্শ দিলেন, যদ্দ্বারা লোক-ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট দণ্ডনীয়, জুগুপ্সিত উপায়ে উক্ত সতীদাহ সংঘটিত না হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এইরূপ রাজাজ্ঞা হইল, “অগ্রে মাজিষ্ট্রেট্‌কে বা প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীকে না জানাইয়া, ইংরাজাধিকারে সতীদাহ কদাচ হইতে পারিবে না। সে নারী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় 'সতী' হইতেছে কি না, তাহা উক্ত মাজিষ্ট্রেট্ বা পুলিস কর্ম্মচারী স্থির করিবেন। ঐ সহমরণার্থিণী নারীকে কোনও উন্মাদকর, উত্তেজক বা মত্ততাজনক দ্রব্যাদি সেবন করান হইয়াছে কিনা, সে নারীর ষোল বর্ষ বয়স পূর্ণ হইয়াছে কি না, সে গর্ভিণী কি না এ সকল বিষয় তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক জানিবেন। কারণ, ঐ সকল স্থলে তাহার সহমরণ নিষিদ্ধ। উক্ত সহমরণ, পুলিসের সাক্ষাতে হইবে। উহাতে কোনও ভয় প্রলোভন প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ হয় নাই, ইহা তদন্ত করিয়া, পুলিস অনুমতি

দিলে, তবে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এ সকল উপায় ফলপ্রদ হয় নাই। তৎপরে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের প্রতিকূলে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহর্ষ্ট সহমরণকে আইন বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, যে নারী সহমরণের ইচ্ছা করিবেন, তিনি স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট্‌কে সে অভিপ্রায় জ্ঞাত করিবেন। যে সকল পরিবারে সহমরণ ঘটিবে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট সরকারে কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না, এবং সেই সতীর ও তাহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষ-ভুক্ত হইবে। *

কিন্তু এ সকল রাজবিধি অভীষ্টসাধনে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইল না। শেষে লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক এ প্রথার উন্মূলন করেন। তিনি এ দেশে আসিয়াই, কতিপয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট একখানি পত্র প্রচার করেন। তাহাতে তিনি সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর, তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে, তিনি ইংরাজাধিকৃত ভারতে ঐ প্রথা দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে, মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরাল মহোদয় একটী রাজবিধি (Regulation XVII, of 1829) বিধিবদ্ধ করিলেন। উহাতে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত রহিল যে, জীবিতা কোনও হিন্দু বিধবাকে দগ্ধ বা সমাহিত করিলে তাহা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ ও ফৌজদারি আদালতে দণ্ডনীয় হইবে।

উক্ত বিধির উপক্রমণিকা (Preamble) আলোচনা যোগ্য। উহাতে লিখিত আছে, "সতী" প্রথা অর্থাৎ বিধবা হিন্দু রমণীকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা বা সমাহিত করা, মানব হৃদয়ের একান্ত অসহ্য ও অতীব

* পি. এন্. বসুর "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিরোধী কাণ্ড! এ কার্য্য, হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রে কুত্রাপি অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। প্রত্যুত, হিন্দু বিধবার পক্ষে বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক, যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যপালনই শাস্ত্রে বিশেষরূপে উপদিষ্ট ও শ্রেষ্ঠকল্পরূপে কথিত হইয়াছে। এ 'সতী' প্রথা সমগ্র ভারতের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা পালিত হয় না। কতকগুলি সুবিস্তীর্ণ জিলায় এ প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। যে সকল স্থানে সতী-দাহ ঘটিয়াছে, তথায় প্রায়ই এরূপ বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে যে, তাহা হিন্দুগণের নিজেরই চক্ষে অন্যায় ও বীভৎস ব্যাপার এবং তাহাদের নিজেরই সাংঘাতিক মর্ম্মভেদী। একার্য্যে লোকদিগকে ভগ্নোৎসাহ বা নিবারিত করিবার জন্য, ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, সে সকল উপায়ে উদ্দেশ্যসাধন হয় নাই। এ জন্য সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের মনে এই বিশ্বাস গভীররূপে বদ্ধমুল হইয়াছে যে, যাবৎ এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত না হয়, তাবৎ ইহার আনুষঙ্গিক অত্যাচার পরম্পরা নিবারিত হইবে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরাল, ভারতে ব্রিটীশ শাসন তন্ত্রের যাহা সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মূলসূত্র অর্থাৎ, "ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর সমস্ত প্রজাবর্গ, মনুষ্য-মাত্রোচিত দয়া ও ন্যায়পরতারূপ সনাতন কর্ত্তব্যের অবিরোধে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত আচার-ব্যবহার সকল স্বচ্ছন্দে পালন করিতে পারিবে" এই উদার শাসন নীতি হইতে বিচলিত না হইয়া, নিম্নলিখিত রাজবিধি সকলের স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এই বিধিবদ্ধ রাজ বিধান সকল, 'ফোর্ট উইলিয়ম্' অধিকারের অব্যবহিত এলাকাভুক্ত সমস্ত প্রদেশে বিঘোষিত হইবার পর হইতেই সর্ব্বত্র বলবৎ থাকিবে। কোথাও এরূপ 'সতী' হওয়ার সংবাদ পাইবা মাত্র এ বিষয়ে

স্থানীয় জমিদার ও পুলিস কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

চড়ক সন্ন্যাসে 'বাণফোঁড়া' প্রথার নিবারণ, 'সতী' দাহ নিবারণের ন্যায় উল্লেখ যোগ্য না হইলেও, ইহা গবর্ণমেণ্ট কৃত অন্যতম সামাজিক-সংস্কার। ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মিসনরি সম্মিলনী গবর্ণমেণ্ট সমীপে একখানি আবেদন পত্র উপস্থিত করিলেন। বার্ষিক চড়ক পূজার প্রধান তিন দিন যে ঘোর অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ঐ আবেদনে তাঁহারা সে সকলের দমন প্রার্থনা করেন। উহাতে তাঁহারা উল্লেখ করেন,—ঐ সন্ন্যাসীরা উচ্চ মঞ্চ (ভারা) হইতে, লৌহ কণ্টক ও ছুরিকার উপর ঝম্প দিয়া পড়ে। তাহারা নিজ হস্ত, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করে। শরীরের মাংসের অভ্যন্তরে সূত্র প্রবেশ করিয়া দেয়, অথবা অনবরত অগ্নিতাপে উত্তপ্ত বর্শা শরীরে বিদ্ধ করে; কেহ কেহ পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে বিদ্ধ আংঠাতে ঝুলিতে থাকে। বঙ্গের ছোট লাট স্যার ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে (Sir Frederick Halliday) সবিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন,—এই বাণফোঁড়া ব্যাপার তাদৃশ সন্ন্যাসিগণের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত। এজন্য ইহার প্রতীকার শিক্ষক ও মিসনরিগণের হস্তে। ইতি পুর্ব্বে এ বিষয়ে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরগণ যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, তদনুসারে এ সকল নিষ্ঠুর ব্যাপার, রাজ বিধিদ্বারা না হইয়া, নৈতিক বলেই নিবারিত হওয়া উচিত।*

১৮৫৯-১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, যখন স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট (Sir John Peter Grant) বঙ্গের ছোট লাট, সেই সময়ে, কলিকাতা মিশনরি

---

* বাক্‌লাণ্ড সাহেব কৃত "লেফটেনাণ্ট্ গবর্ণরগণের অধীনস্থ বঙ্গদেশ" প্রথম খণ্ড, ৩২, ১৭৭, ৩১২ পৃষ্ঠা।

সমিতি (Calcutta Missionary Conference) উক্ত প্রথা নিবারণ জন্য পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিলে ঐ আবেদন খানি ষ্টেট্‌সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হইল। মহামহিমশালিনী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সচিবগণ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন,—এ প্রথার নিবারণ বিষয়ে কোনও সুযোগই উপেক্ষিত হইবেনা। তাঁহারা আরও আজ্ঞা দিলেন, যে, অতঃপর গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যে সকল ভূমি পত্তনিরূপে বিলি করিবেন, সে সকলে গবর্ণমেণ্টের এই রূপ সর্ত্ত থাকা উচিত যে, তদ্বারা উক্ত প্রথার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অতি মাত্র প্রতিকূলতা ব্যক্ত হইবে; দেশীয় সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে সম্যক্ সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। আর, স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট যে, এ সকল বীভৎস দৃশ্যের কোন ক্রমেই অনুমোদন করেন না, ইহাও জনসাধারণের নিকট ক্রমশঃ প্রচার করিতে হইবে। স্যার জন গ্রাণ্ট মহোদয় এ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিসনরগণের রিপোর্ট তলব করিলেন। অনন্তর সেই রিপোর্টে তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, এই বাণ ফোঁড়া ব্যাপার শুধু বঙ্গে ও উৎকলে প্রচলিত। যে সকল প্রদেশে এ ব্যাপার চিরাচরিত প্রথারূপে প্রচলিত আছে, সেই সকল প্রদেশের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি আদেশ হইল, যে, তাঁহারা যেন স্বকীয় ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রভাবে এবং তত্রত্য জমিদারগণের আনুকূল্যে এরূপ চেষ্টা করেন, যাহাতে লোকে ইহার অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, স্বেচ্ছায় এ প্রথা পরিহার করে। যথায় এ চড়ক ব্যাপার চির প্রতিষ্ঠিত প্রথা নহে, কেবল একটী সাময়িক প্রদর্শনী মাত্র, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটগণের উপর এই কর্ত্তৃত্ব প্রদত্ত হইল যে, তাঁহারা সমাজের শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার রক্ষার্থে, সেই সেই স্থলের পুলিসের অবলম্বিত স্থানোপযোগী উপায় সকল প্রয়োগ করিয়া ইহার

প্রতিষেধ করেন। ক্রমে ক্রমে এরূপ সংবাদ প্রচারিত হইল এ প্রথা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে।

১৮৬৪-৬৫ সালে, এ বিষয়ের পুনরুত্থাপন হইল। বঙ্গের ছোট লাট স্যার সিসিল বীডন মহোদয় ১৮৬৫ সালের ১৫ই মার্চ্চে একটী প্রতিজ্ঞা পত্র প্রচার দ্বারা, এ নিষ্ঠুর প্রথার নিবারণ করিলেন। বঙ্গ দেশের সমস্ত মাজিষ্ট্রেটগণের উপর এই ভার প্রদত্ত হইল, যে, তাঁহারা এরূপ আদেশ প্রচার করিবেন, যাহাতে কেহই প্রকাশ্য ভাবে এ সকল বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি ঘোর আত্মনির্য্যাতন কার্য্য করিতে না পারে বা তদ্বিষয়ে উৎসাহ বা সাহায্য দান না করে। যাহারা ঐ রূপ করিবে, মাজিষ্ট্রেটেরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের দমন করিবেন। যাহারা তাঁহাদের আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহারা আইন মত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

সতী দাহ নিবারণ ও বাণ ফোঁড়া নিবারণ, এই দুইটী সামাজিক সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় ও উল্লেখ যোগ্য। কারণ, ইহাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট লোকের সামাজিক বা ধর্ম্ম ঘটিত রীতি-নীতি-আচার পদ্ধতি বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যথায় লোক সমাজ এ সকল কুপ্রথা নিবারণে নিতান্ত অক্ষম বা উদাসীন, সেই স্থলেই গবর্ণমেণ্ট অগত্যা স্বয়ং তন্নিবারণে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত উভয় ঘটনাতেই বুঝা যায়, যে, গবর্ণমেণ্ট অগ্রে লোক সমাজকেই তাহাদের নিজ দোষ সংশোধনের সর্ব্ব প্রকার সুবিধা দিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে, এক দিনেই উহা তুলিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে উহার অপকারিতা লোক সমাজকে বুঝাইয়া, ক্রমশঃ উহার নিবারণে অগ্রসর হইয়াছেন। এদেশে সতী দাহ প্রথা বহু কালাবধি প্রচলিত ছিল। কিন্তু

গবর্ণমেণ্ট এ লোমহর্ষণ প্রথা স্বচক্ষে দেখিয়াও, একদিনে তুলিয়া দেন নাই। ক্রমশঃ নানা উপায়ে লোকসমাজকে ইহার অপকারিতা বুঝাইয়া, এ প্রথা নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ লাগিয়াছিল। লোকের গার্হস্থ্য, সামাজিক বা ধর্ম্ম ঘটিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই যেমন ইংরাজ শাসন নীতির একটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গুণ, তেমনি বীভৎস কুপ্রথা সকল স্বচক্ষে দেখিয়াও, সে সকলে এককালে উদাসীন না থাকা গবর্ণমেণ্টের আর একটী উল্লেখ-যোগ্য গুণ। গবর্ণমেণ্ট এদেশের কোনও সংস্কার কার্য্যেই অতি মাত্র ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন নাই। বরং যতদূর সাধ্য, সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের ধীরতা ও সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিয়াছেন, লোকে আত্মদোষ সংশোধন পূর্ব্বক আত্মরক্ষণে নিতান্তই অক্ষম, তখনই গবর্ণমেণ্ট, প্রবল হস্ত হইতে দুর্ব্বল রক্ষণে, অবিচার অনাচার অত্যাচারাদি নিরাকরণে অগত্যা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

এ দেশে বৃটীশ জাতির প্রাধান্য স্থাপনের পূর্ব্বে শিশু-হত্যা ব্যাপারটী প্রকটভাবেই চলিত ছিল। জননীরা তাহাদের নবজাত শিশুকে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে নিক্ষেপ করিত। তাহারা দেব দেবীর নিকট কোনও অভীষ্ট বিষয় কামনা করিয়া, অথবা কোনও কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে কৃতার্থ হইয়া, তাহারি প্রতিদান স্বরূপ এই কার্য্য করিত। আবার কোনও কোনও স্থানে, বিশেষতঃ পঞ্জাবে, যুক্তরাজ্যে এবং রাজপুতানায়, কন্যা সন্তান জন্মিবামাত্র তাহাকে হত্যা করা রূপ পৈশাচিক ঘটনা বিরল ছিল না। এই লোমহর্ষণ ঘটনার কারণ এই যে, ঐ সকল স্থানে কন্যার বিবাহ ব্যয় অতি গুরুতর। দ্বিতীয় কারণ পাছে ঐ কন্যা কালক্রমে কূলে কলঙ্কানয়ন করে। উক্ত অমানুষিক ব্যাপার গুলি, নিম্নোক্ত উপায়ে রহিত হইয়াছে—উক্ত প্রদেশের সাধারণ ফৌজদারি আইন,

সমস্ত লোকের জন্ম ও মৃত্যুর রেজেষ্টারি জন্য বিশেষ আইন, ঐ রূপ দূষণীয় কার্য্য সকলের নিপুণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ জন্য শাসন তন্ত্র ব্যবস্থা। * ভারতীয় দণ্ড বিধি আইনানুসারে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, বা যে বয়সেরই হউক, মানব মাত্রকেই অভিসন্ধি পূর্ব্বক হত্যা করা হত্যাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ইহার পারিভাষিক আখ্যা "Culpable Homicide Amounting to Murder"। এরূপ অপরাধীর প্রাণ দণ্ড বা চির নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা। উক্ত আইনের সেই বিধানের ব্যাখ্যাস্থলে এ কথা বিশেষ রূপে বিবৃত আছে যে, যদি জীবিত শিশুর দেহের কোনও অংশ মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হয়, এবং যদিও সে সম্পূর্ণ রূপে ভূমিষ্ঠ না হয়, বা নিশ্বাস না ফেলিয়া থাকে, তথাপি এ রূপ অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটাইলে, তাহাও উক্ত (Culpable Homicide Amounting to Murder) অপরাধের সমতুল্য হইবে। † উক্ত আইনে এ বিষয়েরও প্রতিবিধান আছে, যে, দ্বাদশ বর্ষের অনধিক কোনও শিশুর পিতা, মাতা, বা অন্য কোনও প্রতিপালক, যদি সেই শিশুকে এক কালে পরিহারের ইচ্ছায়, তাহাকে কোনও স্থানে ফেলিয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তিও অতি কঠোর রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অরক্ষিত অবস্থায় পতিত সেই শিশু যদি প্রাণত্যাগ করে, তবে সেই অপরাধী হত্যাপরাধে (Culpable Homicide) অভিযুক্ত হইবে। এক শ্রেণীর সম্প্রদায় আছে, যাহারা সময়ে সময়ে তাহাদের কোনও ধর্ম্ম সাধনা বা মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশে নরবলি প্রদানও প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিত—এ জন্য তাহারা স্বহস্তে বা অন্য দ্বারা নরহত্যা করিত। অধুনা ইংরাজ শাসনে তাহাদের আর এ বীভৎস কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ, তাহা করিলে, তাহাদিগকে

---

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ (Strachey's India,) ষ্ট্রাচীর ভারতবর্ষ ৩য় সংস্করণ ৩৯৫-৪০০ পৃষ্ঠা দেখ।

† ২৯৯ ধারা।

নরহত্যাপরাধে বা নরহত্যার সহায়তাপরাধে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। রাজবিধি কখনও পাপের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারে না। অধুনা শিশুহত্যা বা নরবলি কোথাও যে ঘটে না তাহা বলা যায় না। কিন্তু এ সকল কার্য্য অধুনা, করিবার অধিকার আছে বলিয়া প্রকাশ্য ভাবে, অথবা, কোনও কল্পিত ধর্ম্মের ভান করিয়া, কেহই করিতে পারে না। তবে কোনও দুর্বৃত্ত যদি সঙ্গোপনে এ কার্য্য করে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইলেই, সেই নরহন্তা-দুরাত্মাকে আইন মত দণ্ড দেওয়া হয়।

সামাজিক জীবনে বিশেষ আপত্তিকর, এমন কি আইনানুসারে দণ্ডনীয়, প্রথা হয়ত গুপ্তভাবে প্রচলিত আছে, তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজের আইনের বলে, মনুষ্যজীবনের পবিত্রতা সর্ব্বত্রই সম্মানীয় হইয়া থাকে। কেহই অবাধে অপরের গাত্রে বলপূর্ব্বক হস্তার্পণ করিতে পারে না। ইংরাজের রাজ বিধান সমভাবে সকলকেই রক্ষা করিতেছে। এ বিধানে রাজাই হউন বা প্রজাই হউন, ব্রাহ্মণই হউন, বা চণ্ডালই হউন, অভেদে সকলেরি দেহ সমান রক্ষণীয়। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এদেশে এক শ্রেণীর কতকগুলি সামাজিক সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঐ সকল সংস্কার, সামাজিক জীবনে লোকের ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা রক্ষার সহায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের বিধবার পুনরুদ্বাহ পক্ষে হিন্দু সমাজ অতি মাত্র প্রতিকূল। অর্থাৎ, উচ্চ বর্ণের কোনও বিধবা নিজে নিজের কর্ত্রী হইয়াও স্বেচ্ছানুরূপ ও আইন সঙ্গত পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারিত না। সেই বিধবার অভিভাবকেরাও, ইচ্ছা করিলে, তাহার পুনর্ব্বিবাহ দিতে পারিতেন না। বিধবাগণের ও তাহাদের অভিভাবকগণের স্বাধীনতার পক্ষে উক্ত রূপ অন্তরায় সমূহ অধুনা বিদূরিত হইয়াছে। স্বহৃদয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়

সর্ব্ব প্রথম বিধবা বিবাহরূপ সমাজ সংস্কারের অনুকূলে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি অদম্য তেজে ও বিপুল পরিশ্রমে আর্য্য-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক, স্থল বিশেষে যে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, এ কথা প্রমাণিত করেন। এবং বিধবাবিবাহের প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে কয়েকটী দরখাস্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ আইনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এই সম্বন্ধে একটী আইন প্রণয়নে মনস্থঃ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে স্যার্ জে. পি. গ্রাণ্ট (Sir J. P. Grant) মহোদয় গবর্ণর জেনারেল-কৌন্সিলের সভ্যরূপে, বিধবা-বিবাহ বিল উক্ত সভায় উপস্থিত করেন। ঐ সালের পঞ্চদশ বিধিরূপে (Act XV.) ঐ আইন বিধিবদ্ধ হয়। উহা দ্বারা বিধবা-বিবাহ পক্ষে বৈধ বাধা সকল বিদূরিত হইয়াছে। উক্ত বিধবা-বিবাহ বিধির প্রথম ধারায় আছে, যে এই বিধি অনুসারে হিন্দুজাতিমধ্যে যে কোনও বিবাহ হইবে, তাহা রাজবিধানে অবৈধ বা ব্যর্থ বলিয়া গণ্য হইবে না। এবং এই বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সে সন্তান অবৈধ সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে না। এ বিধানের প্রতিকূলে কোনও প্রথা বা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও বচনের কোনরূপ ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হইবে না।*

ইংরাজাধিকারে আর একটী সামাজিক সংস্কারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুজাতি মধ্যে কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তদীয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ জন্য সে ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহার পূর্ব্বাধিকৃত পৈতৃকসম্পত্তি হইতেও বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা থাকিত। পৈতৃক বিষয়াধিকারের

---

* বাক্‌লাণ্ড সাহেব লিখিত "লেফটেনাণ্ট গবর্ণরগণের অধীনস্থ বঙ্গদেশ" প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

এ অযোগ্যতা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের একবিংশ বিধি (Act XXI of 1850) দ্বারা রহিত হইয়াছে। উক্ত বিধিতে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত আছে, যে, অধুনা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ভারতীয় প্রদেশে স্বধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় অথবা জাতিভ্রষ্ট বা পতিত হওয়ায় পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হওয়ার পক্ষে যে সকল আইন বা প্রথা বর্ত্তমান আছে, এখন হইতে তাহা রহিত ও লুপ্ত হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মাধিকরণে এবং রাজকীয় সনন্দ "(Royal Charter)" দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধর্ম্মাধিকরণে সেই সকল পুরাতন আইন বা দেশাচার বলবৎ থাকিবে না বা গ্রাহ্য হইবে না।

এ দেশে পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে কোন স্বদেশীয় ব্যবস্থা ছিল না। এক্ষণে এ দেশে যে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত, তাহা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসী (Lord Dalhousie) বঙ্গীয় শিক্ষা সমিতিকে (The Bengal Council of Education) জানাইলেন—"অতঃপর স্ত্রীশিক্ষা ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিধির অন্তর্ভুক্ত হইবে।" ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টানুমোদিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, দেশীয় ভদ্রলোক সংগঠিত সমিতি কর্তৃক, এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের রাজকীয় লেখ্যপত্র দ্বারা এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা, গবর্ণমেণ্টের অকপট ও আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তালাভ করিবে; কারণ, পুরুষ-শিক্ষা অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা এ দেশের মানবগণের সুশিক্ষা ও সুনীতি বিষয়ে অধিকতর সুকল্যাণ সাধিত হইবে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা কমিসন্ (Education Commission) এই পরামর্শ দান করিলেন, যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উৎসাহ লাভ করিবে, এবং এ পক্ষে গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে বদান্যতা প্রদর্শন

করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত কমিসনের এই অভিপ্রায় কর্ত্তব্যরূপে পরিগৃহীত হইল। এজন্য অনুপাতানুসারে বালকগণের শিক্ষা কার্য্যে যত অর্থ ব্যয় করা উচিত, তদপেক্ষা অধিকতর অর্থ ও তত্ত্বাবধান স্ত্রীশিক্ষায় নিয়োজিত হইয়া থাকে।

এ দেশের সামাজিক সুকল্যাণ সাধনে উৎসুক হইয়া গবর্ণমেণ্ট, লোকের সুনীতি ও সভ্যতা রক্ষার জন্য, কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। এই সকল আইন, নানাবিধ পুলিশ বিধানে ও ভারতীয় দণ্ড বিধিতে দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ বহুতর রাজবিধি প্রদর্শিত হইতে পারে, যদ্দ্বারা,—দ্যূতক্রীড়া, উদ্দাম ও অবৈধ আমোদের আড্ডা, প্রকাশ্য অশ্লীল ব্যবহার, প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল গান, অশ্লীল পুস্তকাদি বিক্রয় প্রভৃতি ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ লোকচরিত্র ভ্রংশকর কার্য্য নিবারিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে, যে কোনও বাক্য বা কার্য্যের প্রকাশ্যভাবে কথন বা অনুষ্ঠান, লোকের সভ্যতার বা নৈতিকভাবের হানিকর, অথবা লোকনীতির পক্ষে দূষণীয়, কিম্বা লোকের নৈতিক আদর্শকে খর্ব্ব করিতে প্রবল, তাদৃশ বাক্য বা কার্য্য, লোকমর্য্যাদারক্ষক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথাসাধ্য নিবারিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষাকার্য্য

শিক্ষা—শিক্ষার প্রশস্ততম ভাব—শিক্ষা বিষয়ে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যভার—রাজনৈতিক বিষয়ের শিক্ষাঘটিত মূল্য—শিক্ষায় স্বতঃসিদ্ধদান—বিদ্যালয়ে শিক্ষা—প্রাথমিক—দ্বিতীয় শ্রেণীর—উচ্চ—ব্যবহারিক শিক্ষা—প্রারম্ভিক শিক্ষা—উচ্চতর শিক্ষা—চিকিৎসা শিক্ষা—আইন শিক্ষা—নর্‌ম্যাল বিদ্যালয়—কৃষি কলেজ—শিল্প বিদ্যালয়—শিল্প শিক্ষা—বিদ্যালয়ে শিক্ষার মৌলিক উপাদান—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্নগণের পরস্পর বাদানুবাদ—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ে রাজলেখ্য—শিক্ষার ভূয়িষ্ঠ প্রচার—বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয় স্থাপন—শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্ম বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নির্লিপ্ততা—শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক উৎকর্ষসাধক বিবিধ ব্যবস্থা।

'শিক্ষা' (Education), এই শব্দটীর প্রশস্ততম অর্থ গ্রহণ করিলে, বলা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যজগতে এই শিক্ষাবিস্তার ইংলণ্ডের একটী সুপবিত্র ও সুমহৎকর্ত্তব্য, এবং ইহাই ইংলণ্ডের উচ্চতম কামনা। ইংলণ্ড এই প্রধানতম কর্ত্তব্যসাধনায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ দেশে ইংরাজ যে সকল আইন প্রবর্ত্তিত ও যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে সকলের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য সামান্য ব্যাবহারিক (সাংসারিক) অভাবের নিরাকরণ নহে। যাহাতে ভারতবাসীর জীবন, নব নব উন্নতির ভাবে ও প্রণালীতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হয়, তাহা করাও ইংলণ্ডের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংরাজ-সাধিত এই উন্নতি পরম্পরার স্বল্পভাগই ভারতবাসীর স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রার্থনায় সম্পাদিত হইয়াছে। ইংরাজপ্রভাবে লোকের মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতের জনসমূহকে মনুষ্যোচিত অধিকার সমূহ দান করিয়া, ইংরাজ

তাহাদের হৃদয়ে স্বাধিকার ভাব জাগ্রৎ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারত-বাসীকে বিবিধ সুমঙ্গল দান করিয়া, ঐ সকল সুমঙ্গলের প্রকৃত মর্য্যাদা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও বিদ্যালয় দ্বারা লোকে ঐরূপ ভাবেই শিক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। যাহাতে তাহারা জীবনের নব নব অভাব এবং মানবের প্রকৃত অধিকার ও কল্যাণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমশঃ মহোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবেই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। যখন জুরিবিচার ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল জনসাধারণ তখন উহার জন্য প্রার্থী ছিল না—এ বিচার প্রণালীর উদ্দেশ্য, প্রজার অবশ্য পূরণীয় কোনও অভাব অনুযোগ নিবারণের জন্য নহে, অথবা কেবল বিচার তন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন জন্যও নহে। প্রজাগণকে নব নব অধিকার প্রদানপূর্ব্বক, তাহাদিগকে রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রে অভ্যস্ত করা, এবং তাহাদিগকে নব নব কর্ত্তব্যপালনে শিক্ষিত করাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। এই জুরি প্রথা দ্বারা লোকে নব নব অধিকার লাভের মর্য্যাদা এতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যে, তাহারা অন্যান্য নূতন নূতন প্রদেশেও এ অধিকার বিস্তার জন্য প্রার্থী। পুনশ্চ, এই স্থানীয় শাসনতন্ত্র প্রথার প্রবর্ত্তনের বা প্রস্তাবনার পূর্ব্বে, লোকে এ অধিকার লাভের জন্য কোন আন্দোলনই করে নাই। এজন্য বলিতে হইবে যে, গবর্ণমেন্ট লোকহিতার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এ অধিকার দান করিয়াছেন। এই স্বায়ত্তশাসন দ্বারা প্রজাবর্গ যে কল্যাণ পরম্পরা লাভ করিয়াছে তাহা তাহাদের নিকট অননুভূত ছিল। এজন্য আশা করা যায়, যে, লোকসমাজ ক্রমেই ইহার মর্য্যাদা বুঝিবে। আরও আশা করা যায় ইহা দ্বারা নব নব অধিকার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নব নব কর্ত্তব্য পালনেও শিক্ষিত হইবে। লোকসমাজে শিক্ষা-সমুন্নতিই স্বায়ত্তশাসনের

শ্রেষ্ঠ মূল্য। শাসনকর্ত্তৃগণের এ উদ্দেশ্যটী লোক-হৃদয়ে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এক্ষণে এ প্রণালীর সম্প্রসারণ ও পরিপোষণ জন্য লোক-সমাজ নিরতিশয় সমুৎসুক। এ বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবশ্যক। ইতিহাস-পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় যে,—ইংরাজের মাতৃভূমি ইংলণ্ডে, যে সকল প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা, প্রজাসাধারণের ভূয়ো ভূয়ো প্রার্থনায় এবং সময়ে সময়ে প্রবল উত্তেজনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এদেশে সে সকল ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের স্বতঃপ্রবৃত্ত দান। ঐ সকল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, শাসন-তন্ত্রের উৎকর্ষ বিধান মাত্র নহে। পরন্তু, ভারতীয় লোকবৃন্দের রাজনৈতিক শিক্ষা বিধানও ইহার উদ্দেশ্য। এ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী তিনটী অধ্যায়ে বর্ণিত সংস্কারের কথা, তিনটী শীর্ষে বিভক্ত করা গিয়াছে—অর্থ-নৈতিক, প্রাকৃতিক ও পৌরসম্বন্ধীয়। এই ত্রিবিধ সংস্কারের উদ্দেশ্য, নিঃসংশয় এ দেশের কোন না কোনও কল্যাণ সাধনের দিকেই প্রবর্ত্তিত। কিন্তু অপর পক্ষে দেশের লোককে নানাবিধ শিক্ষাদানও ইহার উদ্দেশ্য। ভারতবাসীর সম্মুখে নব নব সমুন্নতির আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে নব নব সমুন্নত চিন্তাশীলতায় অভ্যস্ত করা, তাহাদের জীবনকে নব নব উৎকর্ষ সোপানে উন্মুখিত করা, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণা-শক্তিকে বিবিধ কল্যাণমার্গে প্রবর্ত্তিত করা, ভারতশাসনকর্ত্তৃগণের আন্তরিক কামনা। ভারতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্যপরম্পরার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতবাসীকে প্রকৃতভাবে শিক্ষাদানে সমুন্নত করাই ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য। ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এ দেশে যাহা কিছু করিয়াছেন বা যাহা কিছু করিতে পারেন সে সমস্তই এই একটী কথা 'শিক্ষার' অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রজাবর্গের শিক্ষার প্রকৃত অর্থ তাহাদের উন্নতি।

যাহাতে ব্রিটীশ পালিত প্রজাপুঞ্জ সন্মার্গে অবিচলিত থাকিয়া, দিন দিন জ্ঞানে-পুণ্যে ও নব নব অভ্যুদয়ে সমুন্নত হয়, তাহাই ইংরাজ প্রবর্ত্তিত লোক শিক্ষার অভিপ্রায়। বিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষা (academic education), যে মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও যে সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ শিক্ষা প্রদত্ত হয়, এবং ছাত্রের মানসিক (intellectual), যান্ত্রিক (mechanical), এবং সৌন্দর্য্যবিধায়িনী* (æsthetic) শিল্পাদি শিক্ষা প্রদানার্থ যে সকল সদুপায় ও সুবিধা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে, এ অধ্যায়ে সে সকল বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষণীয় বিষয়ানুসারে শিক্ষাকে নিম্নোক্ত ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা;—সাহিত্যিক-শিক্ষা (literary), বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা (scientific), নৈতিক শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, চিত্রাদি কলাবিদ্যা বিষয়ক। শিক্ষা প্রসার বা বিস্তৃতি অনুসারে গণনা করিলে, শিক্ষাকে এই কয়ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা;—আদ্য বা প্রাথমিক (primary); মধ্য (secondary); এবং উচ্চতর শিক্ষা (higher)। শিক্ষা প্রণালীর বিভিন্ন অংশের বর্ণনায় ভারতবর্ষে এই সকল নাম ব্যবহৃত হয়।

যে সকল বিদ্যালয়ে বালকগণের প্রথম পাঠ্য (বর্ণ পরিচয়াদি) আরম্ভ হয়, সে সকলকে আদ্য বা প্রাথমিক (primary) বিদ্যালয় বলে। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য সর্ব্বত্র সমান নহে। অথবা, কার্য্য নির্ব্বাহ প্রণালীও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। আদ্য বা প্রাথমিক স্কুল সমূহের অধ্যাপনা রীতি, সেকালের গ্রাম্য পাঠশালা বা মাক্‌তাব্ (maktab) প্রভৃতির পাঠনারীতি হইতে ভিন্নরূপ। কারণ আদ্য বা প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষাদান প্রণালী সমধিক উন্নত ও সুশৃঙ্খল। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলি বালকগণকে তাহাদের মাতৃভাষায় পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেয়। যাহাতে বালকেরা ছোট ছোট (তেরিজ

জমা খরচ প্রভৃতি) অঙ্ক আয়ত্ত করিতে পারে,—সহজ সহজ দেশীয় হিসাব পত্র ও গ্রাম্য জমি জিরাতের দলিল পত্রাদি বুঝিতে পারে, এবং পদার্থের সাধারণ প্রাথমিক জ্ঞান (rudimentary knowledge) এবং ভূগোল, কৃষি বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ভারতের ইতিহাস বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়। * সকল নগরেই এইরূপ পাঠনা রীতি প্রচলিত। গ্রাম্য পাঠশালা সমূহে অধিকতর প্রাথমিক পাঠ সকল প্রচলিত। অধুনা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই সাক্ষাৎভাবে মিউনিসিপালিটি সমূহের এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বা স্থানীয় সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীন। বঙ্গদেশে ও বর্ম্মায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বভার বেসরকারি স্থানীয় লোকের পরিচালনাধীন। দেশীয় ভাবে গঠিত ঐ সকল বিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের উদ্দেশ্যানুরূপ আদর্শে গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বহু বিদ্যালয় অধিকতর আধুনিক ভাবে, দেশীয় স্বত্বাধিকারীর যত্নে স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু বিদ্যালয় বিবিধ মিসনরি সমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টার্স" জনসাধারণ মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বাধ্যতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টও উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। যাবৎ আদ্য বা প্রাথমিক শিক্ষা আশানুরূপ সমুন্নতি লাভ না করিয়াছে তাবৎ এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উত্তরোত্তর অধিকতর প্রযত্নই লক্ষিত হইয়াছে। তথাপি, প্রাথমিক শিক্ষা অদ্যাপি আশানুরূপ ফল লাভ করিয়াছে, এ কথা বলা যায় না।

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার", চতুর্থ খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহ (Secondary Schools) তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ;—(১) মধ্য-বিদ্যালয় ; (২) ইংরাজি-মধ্য-বিদ্যালয় ; (৩) উচ্চ-বিদ্যালয়। মাতৃভাষায় মধ্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য, প্রাথমিক পাঠ্যের সম্প্রসারণ, মধ্য শ্রেণীর ইংরাজি স্কুল সমূহে ইংরাজিই প্রধান ভাষারূপে পঠিত হয়, এবং ইংরাজিই শিক্ষাদানের দ্বার স্বরূপ। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য, মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠ্যের অনুরূপ। উচ্চ বিদ্যালয় সকল, বা বঙ্গদেশে আখ্যাত, উচ্চতর ইংরাজি স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যাপিত হয়। সাধারণতঃ ঐ সকল বিদ্যালয়ে সর্ব্ব প্রথম পাঠ্য পুস্তক হইতে পাঠনা আরম্ভ হয়। যে সকল বালক অন্য কোথাও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা উক্ত বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে পড়িবার উপযুক্ত, সেই শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

যে সকল কলেজ যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, সে সকল কলেজে উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ অধ্যাপক ও "(Reader)" পাঠকদ্বারা এবং অন্যান্য প্রকারেও উচ্চ শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর ও এলাহাবাদ, এই পাঁচটী প্রদেশে পাঁচটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টিত। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, (যাহা পূর্ব্বে লাহোর ইউনিভার্সিটী কলেজ নামে অভিহিত ছিল) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঢাকা ও পাটনায় এবং বর্ম্মা ও নাগপুরেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে।

ইংরেজাধিকৃত ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ১৮৫৭ সালের বিধি অধুনা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত রাজবিধি

অনুসারে, ছাত্রগণের শিক্ষাদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ, ছাত্রগণের জন্য উপদেষ্টৃ নিয়োগ, শিক্ষা সংক্রান্ত দান গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগার, বৈজ্ঞানিক ছাত্রাগার, ও চিত্রশালা নির্ম্মাণ এবং উহার সংরক্ষণ, ছাত্রগণের বাসস্থান ও চরিত্র বিষয়ে নিয়মাদি সংগঠন, এবং সাধারণতঃ ছাত্রগণের পাঠ ও শাস্ত্র তত্ত্বানুসন্ধান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানোন্নতিকর বিষয়ের যথাবিধি সম্পাদনের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। Chancellor, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য) একজন "রেক্‌টার" (Rector) "ভাইস্ চান্‌সেলার" (Vice-Chancellor), পদাধিকারী সদস্য (Ex-Officio Fellows) এবং সাধারণ সদস্য (Ordinary Fellows) এই সকল মনীষী দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত। ১০ জনের অনধিক উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী পদাধিকারী সদস্য (Ex-Officio Fellows) হইয়া থাকেন। স্বয়ং চান্‌সেলার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও "ফ্যাকাল্‌টিগণ" (Faculties) কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত রেজেষ্টারিভুক্ত (Registered) বিশ্ববিদ্যালয়োপাধিপ্রাপ্ত মনীষীবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে সাধারণ সদস্য (Ordinary Fellows) বলে। সাধারণ ফেলোগণ পাঁচ বর্ষের জন্য উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কলিকাতা, বোম্বে, ও মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে 'ফেলো'গণের সংখ্যা পঞ্চাশতের অন্যূন ও একশতের অনধিক হওয়া চাই। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্‌সেলার—বঙ্গদেশের গবর্ণর ইহার রেক্টর। অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও তৎ-প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তাই তত্রত্য চান্‌সেলার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরীক্ষার সোপান অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা উপযুক্ত পাত্রে, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়ম বিধি দ্বারা বিধিবদ্ধ, এরূপ সম্মান-সূচক উপাধি ও অধিকার সকল (Diplomas, licenses, titles, marks of honour etc) প্রদান করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজ সকলকে স্বাধিকারভুক্ত (Affiliate) করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন এবং নিজস্ব কলেজ সকলকে নিজব্যয়ে সংরক্ষণ করিতে পারেন। কোনও কলেজকে স্বাধিকারভুক্ত করা না করার পক্ষে সিনেট সভা নিজ অভিপ্রায় ভারত গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন। গবর্ণমেণ্টই তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন। সিনেট কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণ, আইন ও চিকিৎসা বিষয়ে উপাধি দিতে পারেন। মান্দ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পৃথক স্কুল আছে এবং এলাহাবাদ ব্যতীত অন্যান্য স্থলে উপাধি বা সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা আছে।

এ অধ্যায়ে এদেশে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের উদার শিক্ষাদান নীতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ প্রকারে শিক্ষাদানার্থ নানা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়টী (Technical education) অগ্রেই গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক বঙ্গের ছোটলাট স্যর সিসিল বীডন মহোদয় (Sir Cecil Beadon) সর্ব্ব প্রথম বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয় (Industrial Schools of Arts) সংস্থাপনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হয়, যদিও কতকগুলি দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এবং ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমিতির নাম, "The Society for the promotion of Industrial Arts" ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা গবর্ণমেণ্টেরই সাহায্যাধীন হইয়া পড়ে। যাহাতে এ দেশের লোকগণ শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ে সমুন্নত রুচি এবং উহার প্রকৃত মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করে, যাহাতে নব নব বিচিত্র চিত্র সৌন্দর্য্যের সজ্জা দ্বারা স্বদেশের শোভা ও গৌরব সম্পাদন করে,

এবং এ বিদ্যার সাহায্যে দেশে নক্সাকারী, (কারুকার্য্যের উদ্ভাবক) স্থপতিগণ, (আদর্শ নির্ম্মাতা) প্রস্তরলিপিকারী খোদাইকারী (ভাস্কর, প্রস্তরাদি ফলক খোদক) প্রভৃতি কারু সমুদিত হইয়া, দেশের বহু অভাব মোচন করে, সেই মহা কল্যাণকর উদ্দেশ্যে এই কলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গের ছোটলাট স্যার্ রিচার্ড টেম্পেল (Sir Richard Temple) মহোদয়ের শাসনকালে, হুগলী, ঢাকা ও কটক প্রদেশে জরিপ শিক্ষালয় (Survey Schools) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়—ব্যবহারিক শিক্ষা (technical education) যথেষ্ট সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে শিল্পাদির ব্যবহারিক শিক্ষার বিশেষ প্রচার ছিল না। যাহা সামান্য ছিল, তাহাতে হস্তশিল্পী জাতীয় কারিকরেরা (Handicrafts-men) আপন আপন সন্তানকে তাহাদের জ্ঞানানুরূপ শিক্ষা দিত। সূত্রধর (ছুতার) জাতীয় ব্যক্তিরা আপন আপন সন্তানকে সূত্রধরের কার্য্য (কাষ্ঠ শিল্প) শিখাইত, অন্যান্য কারিকরেরা আপন আপন পুত্রদিগকে নিজ নিজ কার্য্য শিখাইত। এইরূপ এক এক ব্যবসায় জাতীয় ব্যবসায় রূপে সেই সেই শ্রেণীতেই আবদ্ধ ছিল। ইদানীং শিল্প বিদ্যালয়ে যে শিল্প বিদ্যা শিক্ষিত হইয়া থাকে, তাদৃশ সমুন্নত শিল্প বিজ্ঞান তৎকালে প্রচলিত ছিল না। কিছু দিন হইতে এদেশে এ বিদ্যার সমাদর বাড়িয়াছে; এ সকলের প্রচারার্থে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে এ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য একটী কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ১২৩টী শিল্প বিদ্যালয়ের তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ সকলের অধিকাংশই স্বল্পকাল হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় গুলির কয়েকটী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। কতকগুলি মিউনিসিপালিটি ও স্থানীয় বোর্ডের (Local Board) সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন অপরাপর

বিদ্যালয় মিসনারী সভা ও অন্যান্য ভদ্রলোকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত। শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন রূপ সমস্যা, কিয়ৎকালাবধি গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন রহিয়াছে। এ শিক্ষায় যাহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসর, এরূপ কতকগুলি ছাত্রকে, ইউরোপে বা আমেরিকায় গিয়া এই ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিক্ষা লাভের জন্য গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহে উচ্চতর এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাবহারিক শিল্প-শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গ, ও যুক্তপ্রদেশ এই কয় প্রধান প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশের রুরকী কলেজ ও শিবপুর এবং পুনার কলেজগুলিই বৃহৎ। বোম্বে নগরের ("Victoria Jubilee Technical Institution") ভিক্টোরিয়া জুবিলী ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষালয়, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতিদিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোর, এই চারি প্রদেশে সংস্থাপিত কলেজ সকলে এবং মেডিকেল স্কুলে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা (medical education) প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ সকল বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত। কলিকাতা ও মান্দ্রাজের কলেজ দুটী যথাক্রমে ১৮৪৫ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। ধর্ম্ম ঘটিত কুসংস্কার বশতঃ পূর্ব্বে এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী লোকের নিকট অতিমাত্র ঘৃণিত ছিল। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে, যিনি তথায় সর্ব্বপ্রথমে শবচ্ছেদ করেন, তিনি দেশ মধ্যে একজন অসমসাহসিক পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। উক্ত কলেজে ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ছাত্রবৃত্তি (Stipends) প্রদত্ত হয়। সম্প্রতি বেসরকারী মেডিকাল স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল বিদ্যালয় ক্রমশঃই সাধারণের এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এতদ্দেশীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা বৃদ্ধি করিতেছে।

আইন (ব্যবহার শাস্ত্র) শিক্ষা দিবার জন্য, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোর এই তিন প্রদেশে কৈন্দ্রিক আইন কলেজ (Central Law College) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা প্রধানতঃ "Arts College" নামে অভিহিত, যুক্তপ্রদেশে ও অল্পদিন পূর্ব্বে বঙ্গের আইন কলেজ শ্রেণী সকল, তাহারি বিভাগ স্বরূপ। সম্প্রতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যানসেলার মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটী আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ১৬০০ ছাত্র এই কলেজে অধ্যয়ন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য এবং জনপ্রিয় চ্যানসেলার লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে একটী সুসজ্জিত ছাত্রনিবাস এই আইন-কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

শিক্ষকগণের অধ্যাপনা প্রণালী শিক্ষার্থে যে সকল বিশেষ বিশেষ নর্ম্মাল কলেজ ও নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকল ও অন্যান্য সমস্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় এবং বাণিজ্য বিদ্যা শিখাইবার উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ উদীয়মান বিদ্যালয় সকলের সামান্য ভাবে উল্লেখ করিলেই, গবর্ণমেণ্টের প্রজা শিক্ষায় অসাধারণ যত্ন ও অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাণিজ্য বিদ্যালয় সকল বোম্বে প্রদেশে ভূয়িষ্ঠ সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। তবে, বঙ্গদেশেও ইহা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৃষি বিদ্যা শিক্ষার জন্য, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, যুক্তরাজ্য ও মধ্য-প্রদেশ সমূহে কলেজ ও কলেজের শাখা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে, কলিকাতার সন্নিহিত শিবপুরে, পূর্ব্বে কৃষিবিদ্যাশিক্ষার্থ শ্রেণী সকল (classes) বিদ্যমান্ ছিল। কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতের জন্য একটী মধ্যবর্ত্তী কৃষি কলেজ (Central Agricultural College) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতত্ত্ব গবেষণার্থে উপযুক্ত

শিক্ষালয়, এবং ভূকর্ষণ ও পশুপাল্যাদি শিক্ষার জন্য বিহারের অন্তঃপাতী দ্বারবঙ্গ (দ্বারভাঙ্গা) প্রদেশের 'পুষা' (Pusa) নামক স্থানে একটী আদর্শ শিক্ষালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।* ভাগলপুরের অন্তঃপাতী সাবৌর (Sabour) নামক স্থানে বঙ্গদেশের জন্য একটী কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

জগতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে শিল্পকলাদি বিষয়ে পরস্পর রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতির কলাশিল্পের রুচিবৈচিত্র অনন্যসাধারণ। প্রকৃত বিজ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতি মধ্যে অভিন্ন হইলেও, পরস্পর প্রণালীগত বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। ঘটনাক্রমে, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বে, ও লাহোর প্রদেশে যে সকল কলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সে সকলগুলিই গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বে নগরে কলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বেসরকারী স্কুল সমূহও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে।

এই সকল স্কুল ও কলেজ ব্যতীত, বিদ্যোন্নতি ও গবেষণার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে, তদুপোযোগী পুস্তকালয় ও যাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ (Imperial Library) ইম্পীরিয়াল্ লাইব্রেরি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত।

বহুসংখ্যক গবর্ণমেণ্ট কলেজের সঙ্গে প্রশস্তায়তন পুস্তকালয় সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। সুদুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও তালিকাবদ্ধ করিবার জন্য, দেশীয় প্রাজ্ঞগণ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি পুস্তকালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান করিয়া থাকেন।

---

* ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার, চতুর্থ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারবঙ্গ লাইব্রেরী আকারে, আবশ্যকতায় এবং গুরুত্বে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতেছে।

কলিকাতাস্থ "বস্তুগত উপাদান সম্বন্ধীয় যাদুঘর" ("Economic Museum") বঙ্গের ছোট লাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল (Campbell) মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাত-বিষয়ে যথোচিত জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাতের বিবরণ সংগ্রহ ভাবটীর পোষকতায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্রথম সোপান স্বরূপ তিনি ভাবিলেন যে, এদেশে এরূপ একটী স্থান নিরূপিত হওয়া উচিত, যথায় বস্তুগত উপাদান সম্বন্ধীয় আদর্শ স্বরূপ উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য স্বদেশজ দ্রব্য সঞ্চিত থাকিয়া, সর্ব্ব সাধারণের অনায়াস-লভ্য হয়। অনন্তর, উক্ত কৃষি দ্রব্যজাত সংগৃহীত হইয়া, "ইকনমিক্ মিউসীয়ম" রূপে, কলিকাতায় বিশাল যাদুঘরের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছে। এই স্থানে অসংস্কৃত দ্রব্যজাত (raw materials) ও বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রক্ষিত আছে। লক্ষ্ণৌ ও বোম্বে নগরে এক একটী ঐরূপ প্রদর্শনীশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আদর্শ উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত উদ্যানগুলিও বিশেষ শিক্ষা প্রদান করে।

স্কুল কলেজ সমূহের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ও সে গুলির সংস্কার এবং সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রভৃতি কার্য্যেই কেবল যে গবর্ণমেণ্ট যত্ন করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু লোকের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির সম্যক্ সংস্কার ও পরিপুষ্টি সাধনেও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি এরূপ দ্রুতবেগে সমুন্নতির পথে অগ্রসর যে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা ও তালিকা প্রদান অসম্ভব। কারণ ঐ সকল বিষয়ে কোনও একটী সময়ের যদি তালিকা প্রদত্ত হয়, তবে তাহার ছয় মাস পরবর্ত্তী তালিকার সহিত আর পূর্ব্বোক্ত তালিকার ঐক্য থাকিবে না। এরূপ স্থলে ভারতে শিক্ষাদান বিষয়ে, ইংলণ্ডের যাহা আন্তরিক

ও ঐকান্তিক কামনা, তাহাই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্যক। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রথম এ দেশে, দেশীয় প্রণালীর শিক্ষাকে যে কেবল অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে ; প্রত্যুত যে তদ্বিষয়ে যথোচিত উৎসাহ দান ও তাহার পুরিপুষ্টি সাধনেও যত্ন করিয়াছিলেন, এ বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনন্তর কিছুকাল পরে, ইহা একটী বিবেচ্য বিষয় হইল, যে, উক্তরূপ শিক্ষা প্রজাবৃন্দের মানসিক অভাব গুলির সর্ব্বথা নিরাকরণের পক্ষে যথেষ্ট কিনা, এবং বর্ত্তমান সমুন্নত পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাদৃশ শিক্ষা তাহাদিগকে প্রদান করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে মতামত লইয়া দুইটী পক্ষের সৃষ্টি হইল। উভয় পক্ষেই নানা যুক্তিসহ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু এ দেশের লোকের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে, প্রধানতঃ উভয় পক্ষই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব-বেত্তা, তাঁহারা নানা তর্ক ও যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে, ভারতে শিক্ষা বিষয়ক এ অভাবটী প্রাচ্য (classical অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি) ভাষার ভূয়িষ্ঠ প্রচার দ্বারা পরিপূরণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এ দেশের ব্যবহার শাস্ত্র (স্মৃতি), বেদ, সংহিতা, পুরাণ, দর্শন, কাব্য, ও আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই, হিন্দুজাতির সংস্কৃত ভাষায়, এবং মুসলমান জাতির আরবি ফারসি প্রভৃতি ভাষায় সঙ্কলিত। পক্ষান্তরে, ইংরাজি ভাষার পক্ষপাতীরা এই বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন, যে, এ দেশে উচ্চতর শিক্ষা ইংরাজি ভাষাতেই হওয়া উচিত; কারণ, ইংরাজি ভাষার অন্যান্য গুণ ছাড়িয়া দিলেও, ইহা দ্বারা এদেশের লোকে পাশ্চাত্য, সমুন্নত চিন্তারূপ রত্ন-ভাণ্ডারে প্রবেশের দ্বার প্রাপ্ত হইবে। ইঁহাদের পক্ষে সমাজের নেতা, খ্যাতনামা প্রধান প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব প্রধান। শেষে

ইংরাজি-ভাষা-পক্ষীয়েরাই জয়লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট কাউন্সেলের আইন মেম্বর, এবং শিক্ষা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মেকলে (Macaulay) মহোদয় যেরূপ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার সহিত এ বিষয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, ধরিতে গেলে, তাহাতে তাঁহারি একান্ত প্রযত্নেই ইংরাজি ভাষাপক্ষ জয়লাভে সমর্থন হন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck) মহোদয়, মেকলের অভিপ্রায় অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের তদীয় বিখ্যাত বিবরণী পত্রে (minute) ইহা প্রকাশ করিলেন। ইহার অনতিবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট হইতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর অনুকূলে মীমাংসাসূচক সঙ্কল্পপত্র (Resolution) প্রকাশিত হইল। মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের এই মীমাংসার ফলেই, ইংরাজি ভাষা তদবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এ দেশীয়-গণের উচ্চতম শিক্ষার দ্বারস্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান। যাঁহারা ইংরাজিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনে ও চিন্তায় যেন উন্নতির যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতিস্রোত, তাঁহাদের দ্বারা অসংখ্য ভারতবাসীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, ভারতবাসীর হৃদয়কে সমুন্নত পাশ্চাত্য চিন্তার সংস্রবে আনিয়া, তাহাদিগকে যেন এক তেজোময়ী অভিনবা জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে মাতৃভাষাগুলিকেও শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে এবং উপাধি পরীক্ষার পূর্ব্বে ও পরে ইহাদের শিক্ষা অবশ্যকরণীয় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষার জন্য একজন অধ্যাপক নিয়োগ ও একটী ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইদানীং স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট, খৃষ্টান পাদরি সম্প্রদায়, এবং বিদ্যোৎসাহী স্বদেশীয় মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এদেশের নানা স্থানে স্কুল ও কলেজ সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার যথোচিত সমুন্নতি, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

দ্রুতভাবে সম্পন্ন হয় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগে নবোৎসাহ প্রদর্শিত হইল। স্যার চার্লস উড্—যিনি পরবর্ত্তী কালে লর্ড হ্যালিফক্স হইয়াছিলেন (Sir Charls Wood—Lord Halifox)—বোর্ড অব্ কন্ট্রোল সভার সম্পাদক রূপে (President of the Board of Control), এই মীমাংসা করিলেন যে, ভারতের সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার সুপ্রণালীবদ্ধ সমধিক সমুন্নতি সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্টের যথোচিত সাহায্য দান কর্ত্তব্য। তিনি মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরাল্ বাহাদুরকে যে বিখ্যাত লেখ্যপত্র (Despatch) প্রদান করেন, তাহাতে তিনি সংক্ষেপে সার্ব্বভৌমিক শিক্ষাপ্রণালীর একটী সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অনুষ্ঠানপত্র (Scheme) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষা প্রণালী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং কোনও কোনও অংশ স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত হইবে তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন। উক্ত (Despatch) পত্রে তৎকালে শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত অনুমোদিত হইয়াছিল, সেইগুলি, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ রাজকীয় হস্তে আসিলে, পুনরায় দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছিল।* প্রধানতঃ সেই ব্যবস্থাপত্রেরই নিয়মাবলী দ্বারা, অদ্যাপি প্রশস্ততর ভাবে লোক-শিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের প্রযত্নসকল পরিচালিত হইতেছে। ঐ ব্যবস্থাপত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এক একটী সাধারণ শিক্ষাবিভাগ এবং প্রেসিডেন্সী নগর সমূহে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতের সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বসম্প্রদায় মধ্যে, বর্ণপরিচয় হইতে উচ্চতম শিক্ষার পথ উদার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় ইতিহাসে,

* ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার, চতুর্থ খণ্ড ৪১৩ পৃষ্ঠা।

এই প্রথম উন্মুক্ত হইল। হিন্দুজাতি মধ্যে টোল চতুষ্পাঠী গুলিতে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে কেবল উচ্চ জাতীয় (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি) বর্ণেরই প্রবেশাধিকার ছিল। মুসলমানদের শিক্ষালয়ে, যদিও বোধ হয়, হিন্দুরও প্রবেশাধিকার ছিল, কিন্তু তাহাতে হিন্দুর অধ্যয়ন করা বড় স্বচ্ছ বা সুবিধাজনক ছিল না এবং সেই জন্য উচ্চ শিক্ষায় ধর্ম্ম ঘটিত যে উপাদানের বাহুল্য আছে, তাহা কাজে কাজেই কেবল মুসলমান সম্প্রদায়েই আবদ্ধ ছিল। সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-উচ্চ-নীচ-অবস্থা নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বলোক মধ্যে শিক্ষার দ্বার, মহানুভব ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উন্মুক্ত হইয়াছে। যেমন রাজবিধানে তেমনি শিক্ষা বিধানেও অত্যুদার সাম্যভাব সমাদৃত হইয়াছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এই অত্যুদার মূল উদ্দেশ্যটীর জন্য যে সর্ব্বশ্রেণী মধ্যে শুধুই শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, এরূপ নহে। প্রত্যুত ইহা, ভারতবাসিগণের চিন্তাপ্রণালীকে পরোক্ষভাবে এরূপ পরিচালিত করিয়াছে যাহাতে তাহারা সকলেই জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ সম্প্রদায় ও সামাজিক অবস্থাদি-নির্ব্বিশেষে উত্তরোত্তর মহোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল কলেজ উন্মুক্ত করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হয়েন নাই। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য, বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় সকলও স্থাপন করিয়াছেন; দৃষ্টান্ত স্বরূপ যথা—হীন জাতীয় বালকগণের বিদ্যালয়, য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় বালকগণের বিদ্যালয়, ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সকল বিদ্যালয়ের অধিকাংশ বেসরকারি (private) ব্যক্তিগণের, প্রধানতঃ খৃষ্টান পাদরি-গণের স্থাপিত হইলেও, উহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক যথোচিত উৎসাহ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ সকল বেসরকারি বিদ্যালয়েও সাহায্য দান করা উদারনৈতিক ব্রিটীশ তন্ত্রেই সম্ভবপর। ভারতীয় রাজকুমার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত

বংশের বংশধরগণের যথোচিত শিক্ষা বিধানার্থে অনেক কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সে সমস্তই গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব কীর্ত্তি; এ সকল কলেজের মধ্যে আজমীর, রাজকোট ও লাহোর প্রদেশের কলেজ সর্ব্বপ্রধান। অত্যুচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সর্দ্দার বংশীয় কুমারগণ যাহাতে নিজ মর্য্যাদানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, এই সকল কলেজের ইহাই উদ্দেশ্য।

ভারতীয় প্রজাবৃন্দ জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মাদি ভেদে বহু শাখায় বিভক্ত হইলেও, গবর্ণমেণ্ট কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট লোকশিক্ষা কার্য্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে নির্লিপ্তভাব সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এ নির্লিপ্তভাবের কথা, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সরকারের লেখ্যপত্রে (Despatch) বিঘোষিত হইয়াছে। বেসরকারি বিদ্যালয় সমূহে তৎকর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ছাত্রগণকে অবাধে ধর্ম্মবিষয়ে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাদান করিতে পারেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোনও আপত্তি নাই। কেবল গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে নিজের যাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ সেই খৃষ্ট ধর্ম্মই শিক্ষা দিতে বাধ্য। কিন্তু উক্ত ধর্ম্ম যাহারা স্বীকার করে না, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে উহার শিক্ষা দিতে পারেন না। অথবা, যে ধর্ম্ম সর্ব্ব ছাত্রের স্বধর্ম্ম নহে, তাহাও শিক্ষা দিতে পারেন না। সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, নৈতিক শিক্ষার সাহায্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি নিজ নিজ ধর্ম্মশিক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থাৎ লোকের মানসিক বৃত্তিগুলির সমুৎকর্ষ সাধনে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-কলাপ এ দেশে যেরূপ বহুধা প্রবর্ত্তিত ও সুবিস্তীর্ণ, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; যথা—প্রাথমিক শিক্ষা (primary), দ্বিতীয় শিক্ষা (secondary), এবং উচ্চতর শিক্ষা (higher education)। এই সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিংয়ের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন,

তাহাতে ইহা সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় এই ত্রিবিধ শিক্ষার অধিকাংশ ভাগ গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে পরিচালিত। বিদ্যালয় সকলের জন্য গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে কেবল সরকারি বিদ্যালয়েই সাহায্য দিয়া থাকেন তাহা নহে। বেসরকারী বহু সংখ্যক বিদ্যালয়েও যথোচিত সাহায্য দিয়া থাকেন। কৃষি-বাণিজ্যাদি বিষয়ক পারিশ্রমিক বিদ্যালয় (Industrial), বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় (Scientific), শিল্প বিদ্যালয়, (Artistic institution) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ের ভারও গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার ভার প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টেরই হস্তে। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের শিক্ষাকার্য্যেও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আছে। একদিকে আদিম (সাঁওতাল প্রভৃতি) অসভ্য এবং অন্যদিকে দেশের রাজবংশীয় সম্ভ্রান্তগণ ও সর্দ্দারগণ, এ উভয় পক্ষের যথোচিত শিক্ষা কার্য্যেই গবর্ণমেণ্ট উদ্যুক্ত। এদেশে যে শত শত বিদ্বৎ সমাজ ও পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দানের ফল। গবর্ণমেণ্ট এদেশে যাদুঘর (Museums) প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভারতের ভাবী শাসনকর্ত্তৃগণের সুবিধার জন্য এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক উপাদান সামগ্রীর সহায়তার জন্য, গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় তত্ত্ব যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষিত করেন। গুণশালী গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহদানার্থ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রণীত বহুসংখ্যক গ্রন্থ সকলের উদ্ধার ও প্রচার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এই কার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কোনও বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক হইলে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ম্মচারীগণকেও নিযুক্ত করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকেও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের

উৎকর্ষসাধনের ভার দিয়াছেন। শিমলার সন্নিহিত কশৌলি প্রদেশে এইরূপ একটী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিদর্শন কার্য্য বিবৃত হইবে, সে সকলের প্রকৃতি ও এইরূপ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ের অধিকারভুক্ত সময়ে সময়ে যে লোক-সংখ্যা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাও এই অধিকারের অন্তর্গত।

ইহাতে যে সকল লোক-কল্যাণকর কথা বর্ণিত হইল, সে সকল কার্য্যের অধিকাংশ, সভ্যতায় সমুন্নত দেশ সমূহে তদ্দেশীয় লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ দেশে বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সকলের প্রতিষ্ঠায়, ইংরাজি ও বঙ্গভাষার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে এবং অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থাদির প্রকাশ কার্য্যে, খৃষ্টান পাদরিগণের কীর্ত্তি বহুমূল্য। খৃষ্টান পাদরিগণ যদিও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, এদেশে ঐ সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তথাপি ইহা মনে রাখা উচিত, যে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই, এদেশে খৃষ্টান পাদরিগণের সংখ্যা এত অধিক। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির অনুসরণেই এ সকল লোক-কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত। গবর্ণমেণ্ট যদি ইংরাজি শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হইতেন, তবে ইংরাজি পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা স্বল্পই দৃষ্ট হইত। অধুনা শিক্ষাদান কার্য্যের কিয়দংশ ভার উদ্যমশীল দেশীয় (বেসরকারি) ব্যক্তিগণ বহন করিতেছেন। এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বোম্বাইয়ের মিঃ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, ৺স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবেহারী ঘোষ এবং তাতাভ্রাতৃগণ সদিচ্ছা ও উৎসাহ প্রণোদিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ধরিতে গেলে, এ কার্য্যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। শিক্ষা কার্য্যের প্রধান ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই ইহার পথপ্রদর্শক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধনোন্নতি

কৃষি, কৃষি-কর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য, শস্য, তণ্ডুল, যব, গম প্রভৃতি, পাট, রেশম, চা, কাফি, সিঙ্কোনা, নীল প্রভৃতি কৃষি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য, আত্মনির্ভরতার আবশ্যকতা, উদ্যমশীল ব্যবসায়ীগণের অবাধ কার্য্যক্ষেত্র, প্রদর্শনী, নব নব উদ্ভাবনা বিষয়ে রাজকীয় রক্ষা বিধান, অবাধ বাণিজ্য, শুল্কাদি, ভারতে শুল্কাদির ইতিহাস, কৃষকগণকে ঋণদান, কৃষি ব্যাঙ্ক, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, প্রজা বিষয়ক আইন দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষের নিদান, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, ও দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিপোষণ।

ভারতবর্ষে বহুকালাবধি কৃষিকার্য্যই প্রজাবর্গের সর্ব্ব প্রধান উপজীব্য। অধুনা প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য, যথা, তণ্ডুল, দ্বিদল, যব, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি এবং ভুট্টা, শরিষা, মসিনা, তিল, ইক্ষু, খর্জ্জুর, তুলা, পাট, নীল, তামাক, আফিঙ, তুঁত, চা, কাফি, সিঙ্কোনা, প্রভৃতি। অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা তণ্ডুলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কারণ তণ্ডুলই এ দেশে অধিকাংশ লোকের প্রধান উপজীব্য। নিম্ন বর্ম্মা, ও বঙ্গদেশের বৃহৎ নদীসমূহের ও গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর 'ব' দ্বীপ সকল (delta), সমুদ্র-কূল-ব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড গুলি, এবং ত্রিবাঙ্কুর, মালবার, কাণাড়া, কঙ্কণ প্রভৃতির নিম্নস্তরের ভূভাগ সর্ব্বপ্রকার ধান্য চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট ভাগে ধান্যের চাষ অত্যন্ত বিরল না হইলেও, ধান্য অপেক্ষা অন্যান্য দ্রব্যের চাষই অধিক। আসাম ব্যতীত অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রদেশে, জোয়ার (millets) ধান্যের স্থান অধিকার

করিয়াছে। স্যার উইলিয়ম হণ্টর লিখিয়াছেন, সমগ্র ভারতের কথা ধরিলে, জোয়ারই দেশের মুখ্য খাদ্য-শস্য, এ কথা স্বীকার করিতে হয়।*

প্রায় সমগ্র পাটের চাষ বঙ্গে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে, হইয়া থাকে। হুগলি, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর 'ব'-দ্বীপ সমূহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাট জন্মে। পাটের চাসের সমুন্নতি ও পাটের ব্যবসায়ের প্রসার ইংরাজাধিকারেরই ফল। ইংরাজ বণিকদের শস্য-ব্যবসায়, বিশেষতঃ গমের ব্যবসায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায়, থলিয়ার (গণি ব্যাগের) প্রয়োজনও বর্দ্ধিত হইতেছে। কারণ, থলিয়া, পাটেই প্রস্তুত হয়।† এজন্য, এদেশে পাটের এত আদর। পাটের ব্যবসায়ে অধিক লভ্য হওয়াতে, ক্রমশঃ পাটের চাষোপযোগী ভূমির পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই ধান্য ক্ষেত্রের পরিমাণ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষে রেশমের ব্যবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তুঁত গাছ বা গুটি পোকা যে ভারতবর্ষে প্রথম জন্মে নাই, সে বিষয় এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের জন্য এদেশে স্থানে স্থানে পণ্যশালা স্থাপন কালে, রেশম ব্যবসায়ের অবনতি দেখিয়া, উহাকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবার জন্য, বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেই তুঁতের চাস অধিক পরিমাণে হইত বলিয়া, তাঁহারা বঙ্গদেশে অনেকগুলি রেশমের কুঠী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা ঐ সকল কুঠীতে রেশম বাহির করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন। তথায় কৃষকেরা গুটিপোকা আনিতে লাগিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা গুটি হইতে সূতা বাহির করিবার জন্য,

---

* পি. এন. বসুর "হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

† "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," ১৮৯ পৃষ্ঠা।

ইতালী হইতে একদল সুদক্ষ শ্রমজীবীকে, এতদ্দেশীয়গণের শিক্ষার জন্য আনয়ন করিলেন। ক্রমে বঙ্গদেশের রেশম, য়ুরোপের বাজারে সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ায়, অন্যান্য দেশের রেশম ব্যবসায়কে পরাভূত করিল। বঙ্গদেশে রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ঐ বৎসর কোম্পানি ব্যবসায় ত্যাগ করিলে, উহা সাধারণ লোকের হস্তে আসিল। সেই সময় হইতে রেশম শিল্পের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এক্ষণে রেশমের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হইয়া পড়িয়াছে। জাপান ও চীনের রেশম এবং ভূমধ্য সাগরের উপকূলস্থ দেশজাত রেশম য়ুরোপের বাজারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।*

চা, কাফি, ও সিঙ্কোনার চাষের সহিত সাধারণ কৃষকের প্রায় কোনও সংশ্রব নাই। এ সকলের চাষ ও ব্যবসায়, প্রধানতঃ য়ুরোপের অর্থে ও য়ুরোপীয় শিল্পীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কাফি ব্যতীত অন্যান্য গুলির চাষ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।†

বঙ্গদেশে নীলের চাষ ও তাহার উন্নতি কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহায়তা, সমুন্নতনীতি ও কার্য্য প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত কোম্পানি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ (West Indies) হইতে বিচক্ষণ নীলকরগণকে আনয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করেন। এইরূপে তাঁহারা ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ হইতে ইক্ষু আনাইয়া, নীলের চাষের ন্যায় তাহারও চাষ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে একেবারেই কৃতকার্য্য হন নাই।‡

কৃষিকার্য্য বিষয়ে রাজপুরুষেরা এদেশে কত মহোপকার করিয়াছেন, একজন অভিজ্ঞ লেখক § সে বিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

---

* "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠা।

† "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," ঐ ২০০ পৃষ্ঠা।

‡ "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," ঐ ১৯২ পৃষ্ঠা।

§ "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," ঐ ২০৮-২০৯ পৃষ্ঠা।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় হইতে ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বদেশীয় কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার কল্পে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গদেশে রেশম ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। কারোলিনা (Carolina) দেশের ধান্য, আমেরিকার তুলা, চা, ও সিঙ্কোনার প্রচলন, এবং শণের ছাল হইতে আঁশ বাহির, ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের আদর্শে ইক্ষুর চাষ, এই সকল দ্রব্যের চাষ আবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এদেশে কোনও পদ্ধতি ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সেই অভাব মোচনের অভিপ্রায়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক (Department of Revenue, Agriculture and Commerce) রাজস্ব-কৃষি-বাণিজ্য বিভাগ স্থাপিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে এই বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হয়। মাহাত্মা লর্ড রিপণের শাসনকালে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড রিপণ মহোদয় এদেশে কৃষিকার্য্যের প্রসার ও সমুন্নতি প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিয়াছেন।

"সরকারি কর্ম্মচারীর তত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহাদের কতকগুলির ব্যয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করেন, এবং কতকগুলির ব্যয় দেশীয় রাজা ও জমিদারেরা বহন করেন। বঙ্গদেশে শিবপুরে, বৰ্দ্ধমানে ও ডুমরাউঁয়ে কৃষি বিভাগের এক একটী কৃষি-ক্ষেত্র আছে। শেষোক্ত দুইটীর ব্যয়-ভার বৰ্দ্ধমানরাজ ও ডুমরাউঁ রাজ সরকার হইতে নির্ব্বাহিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহে ও অযোধ্যায় কানপুরে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক পরিচালিত। মান্দ্রাজে সৈদাপেটে গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র আছে। বোম্বায়ের অন্তঃপাতী খান্দদেশে গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। মধ্য প্রদেশস্থ নাগপুরে গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন, পঞ্জাব, আসাম ও বর্ম্মায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে।"

কৃষিশিক্ষার সমুন্নতি সাধন কল্পে গবর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এ দেশের পক্ষে কৃষিকার্য্য যে কিরূপ মূল্যবান্ তাহা গবর্ণমেণ্ট এত ভাল বুঝেন, যে, কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতি সাধন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে কখনও অন্তর্হিত হয় না। এ বিষয়ে তাঁহারা যে অতীতকালেই সাহায্য করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহাদের সাহায্য অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সম্প্রতি মিশর হইতে তুলার বীজ আনাইয়া, এদেশে বপন করিবার কল্পনা হইতেছে। রাজকর্ম্মচারীগণ, পশুরোগ-তত্ত্ব, উদ্ভিজ্জের অনিষ্টকর কীটতত্ত্ব এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সারের গুণাগুণ প্রভৃতির আলোচনা করিতেছেন, এবং এ সকল অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনেক সুফল লাভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা করা যায়।

শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়, প্রজাবর্গের সর্ব্ব প্রধান উপজীব্য। এজন্য এই সকলের সমুন্নতি জন্য প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও পরস্পর সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। পরিশ্রম ও মূলধন, এ দুইটী এই কার্য্যের মূল উপাদান স্বরূপ। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, লোকের পরস্পর বিশ্বাস, বিষয়-জ্ঞান বা বিষয়োপযোগিনী অভিজ্ঞতা, কার্য্য নৈপুণ্য, সাহসিকতা, সাধুতা, সুশৃঙ্খলা শক্তি, সমবেত কার্য্য করণ শক্তি, ও কার্য্যাভ্যাস প্রভৃতি মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক গুণ থাকা আবশ্যক। অর্থ ও লোক দ্বারা প্রজাবর্গের ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। গবর্ণমেণ্ট প্রজার সহিত যৌথ কারবারেও লিপ্ত হইতে পারেন না। রাজায় ও প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহাতে উভয়ের যৌথ কারবার করা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের শাসনভার, বাণিজ্য ব্যবসায়ী কোম্পানির হস্ত হইতে

যখন সম্রাট্ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যৌথ কারবারের কথা কল্পনাতীত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নানা উপায়ে পরোক্ষভাবে এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এবং এরূপ সাহায্য তাঁহারা এদেশে প্রচুর পরিমাণে করিয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে শিল্প শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, এ কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই শিক্ষার বিস্তার কল্পে অনেক প্রস্তাব হইতেছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং নানা কারণে গত কয়েক বৎসরে বাণিজ্যিক ও শিল্প সংক্রান্ত কার্য্যাবলী বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুযোগ পাইলেই, গবর্ণমেণ্ট, স্বদেশী দ্রব্য স্থানীয় বাজারে ক্রয় করিতেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্যাদি বিষয়ে, দেশীয় লোককে বঞ্চিত করিয়া, য়ুরোপীয়গণকে প্রশ্রয়দান গবর্ণমেণ্ট কদাচ করেন না। জাতি বর্ণাদি নিরপেক্ষ হইয়া, গবর্ণমেণ্ট সকলকেই তুল্যাধিকার দান করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে তুল্যাধিকার প্রদান অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের নিকট আর কি উচ্চতর অনুগ্রহ আশা করা যায়? এই মহানুগ্রহ এদেশের লোক অবাধে ও অনায়াসে লাভ করিয়াছে। যে নীলের ব্যবসায় এতদিন য়ুরোপীয়গণের একচেটিয়া ছিল, তাহাও এক্ষণে ভারতীয় কৃষক ও ধনীর হস্তে পড়িয়াছে। মান্দ্রাজ বিভাগে এক সময়ে চায়ের চাষ কেবল য়ুরোপীয়গণের হস্তগত ছিল। অধুনা উক্ত ব্যবসায় সম্পূর্ণ দেশীয় যৌথ কোম্পানি সমূহ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। খনিজ দ্রব্য (পাথুরিয়া কয়লা, অভ্র, লৌহ, প্রভৃতি) বিষয়ক বহুতর কারবারও অধুনা ভারতবাসী দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। এদেশের মূলধনে স্থানে স্থানে কল কারখানা স্থাপিত হইতেছে। স্বদেশী বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি পথে গবর্ণমেণ্ট কখনও কোনও বাধা দেন নাই।

কৃষি শিল্পের প্রদর্শনী দ্বারা দেশের কৃষি শিল্পাদি বিদ্যার ভূয়সী উন্নতি সাধিত হয়। এ সকল বিষয়ে দর্শকগণের মনে নব নব ভাব ও উদ্ভাবনী-বৃত্তির উদ্দীপনা হয়। ইহা দ্বারা প্রদর্শিত দ্রব্য সমূহের বিক্রয়ের পরিসর বর্দ্ধিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এরূপ কল্যাণকর অনেকগুলি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং উহার উদ্যোগীগণকেও যথোচিত উৎসাহ ও সাহায্যদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার একটী প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন কালে বঙ্গের সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর সুন্দররূপে এই সম্বন্ধীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রয়োজনীয় কল কৌশলাদির উদ্ভাবকগণ যাহাতে নির্ব্বিবাদে নিজ নিজ উদ্ভাবনার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাহারও যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোনও ব্যক্তি নিজ উদ্ভাবিত পদার্থের বিশিষ্টাধিকার পত্র (Patent) লইলে, অন্য কেহই সে আদর্শে সে দ্রব্য প্রস্তুত বা অনুকরণ করিতে পারে না। যদি রাজশাসনে ঐ রূপ রক্ষাবিধান না থাকিত, তবে লোকে অনায়াসে সে সকলের নকল প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় পূর্ব্বক, সেই উদ্ভাবনকারীর বিদ্যা, প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফল টুকু আত্মসাৎ করিতে পারিত। তাহাতে প্রতিভাশালী লোকের মনে নব নব আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের ইচ্ছা কদাচ বলবতী হইত না। নবোদ্ভাবিত পদার্থে তদুদ্ভাবন কর্ত্তার মৌলিকতার স্বত্ব রক্ষা বিধান দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এদেশের লোকের নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার শক্তির বর্দ্ধন ও তদ্দ্বারা কৃষি শিল্প কলাদির ভূয়সী সমুন্নতি সাধন করিয়াছেন।

বাণিজ্যের সহিত শুল্কের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ। ইংলণ্ড বহু কাল অবধি, অবাধ বাণিজ্যের মূল তত্ত্বটী গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, আমদানি বা রপ্তানি বিষয়ে, ইংলণ্ড কোনও প্রকার শুল্ক

স্থাপন না করাই স্থির করিয়াছিলেন। উক্ত নিষেধ বিধি কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর স্থাপিত, দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উপর নহে। ভারতের আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক স্থাপন প্রথা কিছু দিন পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। রপ্তানি শুল্ক অপেক্ষা আমদানি শুল্ক অনেক অধিক ছিল। সময়ে সময়ে রপ্তানি দ্রব্যকে শুল্ক হইতে মুক্তিদান করা হইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেবল তণ্ডুল, নীল ও লাক্ষার রপ্তানির উপর শুল্ক স্থাপিত ছিল। যে সকল দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক স্থাপিত আছে ইংলণ্ডীয় তুলা তাহার অন্তর্গত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ভারত সচিব ঐ সকল শুল্ক তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভা (House of Commons) সেক্রেটারি মহোদয়ের নীতির সমর্থন করিয়া ঐ শুল্ক তুলিয়া দিবার আদেশ পত্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অনন্তর পরবর্ত্তী দুই বর্ষে ভারতে নানা দ্রব্যের উপর এবং নানাবিধ, উৎপাদিত তুলার উপর শুল্ক তুলিয়া দিয়া উক্ত রাজনীতি কার্য্যে পরিণত করা হইল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দুইটী দ্রব্য ভিন্ন, অন্যান্য সকল দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করা হইল। কেবল লবণ ও সুরা, এই দুই দ্রব্য আভ্যন্তরিক আবগারি শুল্কের অধীন বলিয়া এই দুই দ্রব্যের উপর শুল্ক রহিয়া গেল। অনন্তর অস্ত্র শস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ রাজনৈতিক কারণে শুল্কাধীন হইল। রুসিয়া ও আমেরিকা হইতে যে সকল কেরোসিন (Petroleum) আমদানি হয়, তাহার উপর সামান্য আমদানি শুল্ক স্থাপিত হইল। এইরূপে আমদানির উপর স্বাধীন বাণিজ্যের মৌলিক ভাবটী কিছু কালের জন্য ভূয়িষ্ঠ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে ভারত বাসীর চা ও কাফির উপর এখনও শুল্ক আদায় হয়। সাধারণতঃ বর্ম্মাদেশীয় চাউলের রপ্তানি হইলে, প্রতি মণের উপর তিন আনা হিসাবে শুল্ক লওয়া হয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজকোষে অর্থের অকুলান হওয়ায়, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন করেন। সুতরাং "অবাধ বাণিজ্য" মতটী পরিত্যক্ত হইল। "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শুল্ক তালিকায় (Tariff) মূল্যবান্ ধাতু ব্যতিরেকে, ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আমদানি হইত, প্রায় সে সকলের উপর শতকরা যে ৫৲ পাঁচ টাকা শুল্ক ধার্য্য ছিল, সেই শুল্কই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপে স্থাপিত হইল।*" রৌপ্য (যাহাতে পূর্ব্বে শুল্ক ছিল না) এবং কিছু দিন পরে কার্পাসজাত দ্রব্যও শুল্কতালিকা ভুক্ত হইল। ১৮৯৬ সালে কার্পাসজাত সূত্রকে শুল্কবিমুক্ত করা হইল। বিদেশ হইতে যে সকল কার্পাসজাত দ্রব্যের আমদানি হইত, তাহাদের উপর শতকরা ৩॥০ এবং ভারতবর্ষের কলে যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহার উপর ঐ হারে শুল্ক আদায় হইত। এখন প্রায় একশত নয় প্রকার নির্দ্ধারিত আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক আছে। অধিকাংশ দ্রব্য হইতে যৎসামান্য শুল্ক আদায় হয়, কেবল কার্পাসজাত দ্রব্য হইতেই সর্ব্বাধিক আয় হয়। ইহার পরই সুরা, কেরোসিন (Petroleum) চিনি, ও রৌপ্যাদি ধাতুর শুল্কের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কৃষিজীবীরা অভাবে পড়িয়া প্রায়ই অত্যধিক সুদে হৃদয়হীন মহাজনগণের নিকট টাকা ধার করে। শেষে সর্ব্বস্বান্ত হয়। কৃষকেরা যাহাতে ঋণ মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে এবং বীজ ও চাষের গরু (হালের গরু) ক্রয় করিবার জন্য গ্রামবাসিগণের সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ দায়িত্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষকগণকে ঋণ দানের প্রথাই সর্ব্ব প্রধান। য়ুরোপীয় কৃষি ব্যাঙ্কের আদর্শে এদেশে পরস্পর সাহায্যে,

* স্যার জন ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ," ১৮৩ পৃষ্ঠা।

সমবায় ঋণদান সমিতি সংস্থাপনের পরীক্ষাও আরম্ভ হইয়াছে, এবং ইহা সম্প্রতি বিশেষ উন্নতি লাভও করিয়াছে। মিতব্যয়িতা, কৃষকগণকে ঋণদান এবং ঋণের সুদের হার হ্রাসকরা, এই সকল সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। মান্দ্রাজে, যুক্ত প্রদেশে, পাঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে এই সকল সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।* বর্ত্তমানে সকলেই ইহার উপকারিতা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

আর একটী কল্যাণকর নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। উহার নাম সেভিংস ব্যাঙ্ক (Savings Bank)। ১৮৮২—৮৩ সাল পর্য্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য, কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। অন্যান্য স্থানে গবর্ণমেণ্ট কোষাগারেই উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু এ প্রথাটী সবিশেষ ফলোপদায়ক হয় নাই। কার্য্য অতি মৃদুভাবেই চলিতে ছিল। ডাকঘর সমূহে সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপনের পর হইতেই দ্রুত পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল, এবং ঐ সকল স্থানে ধন সঞ্চয়কারীর ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণও নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইল। ঐ সকল ব্যাঙ্ক বিশেষ রূপে কৃষিজীবীগণের জন্যই স্থাপিত হয় নাই। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক ঐ সকল ব্যাঙ্ক বহুল রূপে প্রোৎসাহিত হয়। †

রাইয়ত বা প্রজাগণের হিতার্থে গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত বিবিধ প্রজা-বিধানের (Tenancy Laws) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল বিধান, ভারতের স্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকারের। স্থানীয় অবস্থা ভেদে ও প্রচলিত জোত জমার প্রকৃতি ভেদে এই সকল বিধানের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কিন্তু উক্ত সমস্ত বিধানেরই লক্ষ্য এক দিকে।

* "ইম্পিরীয়াল গেজেটীয়ার," ৪র্থ খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা।

† "ইম্পিরীয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থ খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ, যাহাতে অন্যায় বা অসঙ্গত রূপে অর্থগ্রহণ ও অন্যান্য অত্যাচার দ্বারা প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহাই উক্ত বিধান পরম্পরার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রজার স্বত্ব ও দায়িত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করা, রাজস্ব আদায়ের সহজ ও সুবিধাজনক প্রণালী নির্দ্ধারিত করা, এবং সেই সঙ্গে ভূম্যধিকারী ও প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ন্যায়ানুগত সর্ব্ব প্রকার সুবিধা বিধান করা ও তাহাদের স্বত্ব রক্ষাকরাও, এই আইনের উদ্দেশ্য।

দুর্ভিক্ষ দেশের একটী ঘোরতর অমঙ্গলের কারণ। 'অজন্মা' অর্থাৎ শস্য না জন্মিলে বা অত্যল্প মাত্র জন্মিলেও দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, উভয়ই শস্য হানির কারণ; শস্য না জন্মিলে বা স্বল্প পরিমাণে জন্মিলে ধান্যাদি খাদ্যশস্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। তখন কৃষক, সামান্য ব্যবসায়ী, শিল্পী ও মুটে মজুর প্রভৃতি দরিদ্র লোকের কষ্টের একশেষ হয়। ধান্যাদি যে বৎসর যথেষ্ট জন্মে সে বৎসরও ঐ সকল লোকের সংসারে বিশেষ সচ্ছলতা দৃষ্ট হয় না, কারণ, স্বভাবতঃ দারিদ্র্য, বংশ বৃদ্ধি, অপরিমিত ব্যয়, মামলা মোকদ্দমার খরচ, প্রভৃতি নানা কারণে, সচারাচর তাহাদের দৈনিক আয় ও ব্যয় সমান হইয়া যায়। কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হইলে, তাহারা মহা কষ্টে পতিত হয়। দেশে ধান চাউল থাকিলেও, তাহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়। এরূপ স্থলে অন্যের সাহায্য না পাইলে, তাহারা অন্নাভাবে ও কদন্ন ভোজনে পীড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিদেশে ধান্যাদির রপ্তানির জন্য, অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্দ্দৈবে প্রজাপুঞ্জের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। লোকে উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে কষ্ট সহ্য করে। শেষে কষ্টের চরম সীমা উপস্থিত হইলে, সাধারণে জানিতে পারে। তখন গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোক

সাহায্য দান করেন, এবং সময়ে সময়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশ হইতেও সাহায্য গৃহীত হয়।

এ স্থলে সম্ভবতঃ যতদূর দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইতে পারে, এবং উপস্থিত বিপদের যতদূর প্রতীকার করা যাইতে পারে সে পক্ষে গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ১ম;—কৃষি কার্য্যের জন্য জল সেচনের ব্যবস্থা। ২য়;—বৃষ্টি অল্প হইলে, ক্ষতি পূরণের জন্য, এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান সকলে রেলপথ স্থাপন পূর্ব্বক খাদ্য সামগ্রীর দ্রুত পরিচালনা জন্য উপায়। ৩য়;—দুর্ভিক্ষ কালে কার্য্যে অক্ষম লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্নদান এবং কোনও কোনও শ্রেণীর লোকদিগকে রথ্যানির্ম্মাণে ও পূর্ত্তকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আহার দান করা। যাহারা সচরাচর শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেইরূপ বলিষ্ঠ লোকদিগকেই এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। প্রয়োজন মত অসমর্থ লোকদিগকে রাজস্ব হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক মুক্তি দান করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এদেশে বা ইংলণ্ডে সাধারণ চাঁদা সংগ্রহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে ও দেশের অন্যত্র যে ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ একত্র হইয়া দুঃস্থদিগের ক্লেশ নিবারণে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের (যাঁহাদের অধিকাংশই ছাত্র ছিলেন,) উৎকৃষ্ট কার্য্যে মহামান্য বড়লাট হইতে সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টগণের প্রাণ ধারণ ও সর্ব্ব সাধারণের মহোপকার, এই দ্বিবিধ মহোপকার সাধিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে দক্ষিণ প্রদেশে ১৮৭৬—৭৮ সালে ১৮৯৬—৯৭ এবং ১৮৯৯—১৯০০ সালে এই তিনবার ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৭৬ সাল হইতে দুর্ভিক্ষের

উপশম জন্য গড়ে প্রতি বৎসর এক কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হয়। রাজস্বের ক্ষতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরিলে, গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় আরও অধিক হইয়াছিল। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটনের ভারত-শাসনের সময়ে দুর্ভিক্ষের জন্য প্রতি বৎসর দেড় কোটি মুদ্রা কোষাগারে সঞ্চিত রাখিবার স্থির সিদ্ধান্ত হয়। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রজাপুঞ্জকে সাহায্য করিবার জন্য ঐ সঞ্চিত টাকাই সর্ব্বাগ্রে ব্যয়িত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয় করা হয়। ঐ সঞ্চিত টাকা না থাকিলে, এই সকল কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। ১৮৮১ সালে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কিম্বা উহার উপশম জন্য যে সকল প্রদেশে সাধারণ হিতার্থে রাজপথ, খাল, প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যয় দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বহন করিয়াছে।

যে সকল অনুষ্ঠানে দেশ রক্ষা হয় ও যাহাতে অর্থাগম হয়, এরূপ দ্বিবিধ কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে লৌহ বর্ত্ম বা রেলপথ নির্ম্মাণ শাসন প্রণালীর একটী অঙ্গ ছিল। কেবল দুর্ভিক্ষ নিবারণের সহায়তা করিবে বলিয়াই ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। রক্ষণশীল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যে টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ১৮৯৯ সালের শেষে এই নিয়ম রহিত হইয়াছিল। রক্ষণশীল কার্য্যের জন্য এক কোটি মুদ্রার তিন ভাগ নির্দ্ধারিত হইল এবং ঐ টাকা দুর্ভিক্ষ দমনার্থে অবশ্য কর্ত্তব্য রেলপথ নির্ম্মাণ ও পূর্ত্তাদি কার্য্যের জন্যই ব্যয়িত হইতে লাগিল।*

স্যার্ জন ষ্ট্রাচী সাহেব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন, 'গত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে ভারতবর্ষে বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থ খণ্ড, ১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে। এ দেশের ধন বৃদ্ধির ইহা একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ।* ১৮৪০ সালে বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে যে সকল পণ্যের আমদানি হয়, তাহার মূল্য ২০০০০০০০, পাউণ্ড ; ১৮৫৭ সালে, যে বৎসরে ভারত সাম্রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ ভাবে শাসনাধীন হয়, সেই সালে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য ৫৫,০০০,০০০, পাউণ্ড, ১৮৭৭ সালে ১১৪,০০০,০০০, পাউণ্ড, এবং ১৯০০—০১ সালে ঐ মূল্য প্রায় ১৫২,০০০,০০০, পাউণ্ড, হইয়াছিল। অধুনা ভারতের বিদেশীয় বাণিজ্য, গত শতাব্দীর মধ্য-বর্ত্তীকালে, সমগ্র ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের বিদেশীয় বাণিজ্য অপেক্ষা অধিক। ১৯০৬—০৭ সালে সমুদ্র পথে ২৩০,০০০,০০০, পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়াছে। কত শীঘ্র আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা হইতেই সকলে অনুমান করিতে পারেন।*

---

* ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ," ১৮৬ পৃষ্ঠা।

+ ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	টাকা
১৮৭৫—৭৬ হইতে ১৮৮৪—৮৫	টাকা
আমদানি	৬৯,৫৯০০,০০০
রপ্তানী	৮৫,২৩০০,০০০
১৮৮৫—৮৬ হইতে ১৮৯৪—৯৫	টাকা
আমদানি	৮৩,১১০০,০০০
রপ্তানী	১১৭,১৪০০,০০০
১৮৯৫—৯৬ হইতে ১৯০৪—০৫	টাকা
আমদানি	১৪৩,৯২০০,০০০
রপ্তানী	১৭৪,২৬০০,০০০
১৯১১—১৯১২	টাকা
আমদানি	১৯৭,৫৩০০,০০০
রপ্তানী	২৩৮,৩৬০০,০০০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেশের বস্তুগত উপাদান সম্বন্ধীয় উন্নতি

সাধারণের উপকারজনক পূর্ত্তকার্য্য—গবর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য—রাজপথ—রেলওয়ে—টেলিগ্রাফের লাইন—জরিপ—ত্রিকোণমিতি প্রণালী অবলম্বনে ভূমি মাপ—দিগ্‌দর্শনাবলম্বনে ভূমি মাপ—স্থানের বৃত্তান্ত সংঘটিত জরিপ—অরণ্য ভূমির পরিমাপ—সীমান্ত ও সীমান্ত-বহির্ভাগের পরিমাপ—রাজস্ব সংক্রান্ত ভূমির পরিমাপ—গ্রাম—ভূসম্পত্তির বিশেষ বিবরণ সম্বলিত জরিপ—ভারত গবর্ণমেন্টের জরিপ বিভাগ—বিশেষ জরিপ—সামুদ্রিক তত্ত্ব—ভূতত্ত্ব—উদ্ভিদতত্ত্ব—পুরাতত্ত্ব—কারখানা ও কুঠী—বঙ্গদেশের শিল্প—খনিজ বিভব—পতিত জমি আবাদ—পুষ্করিণী ও কূপ—দুর্গাদি—পোতসংস্কার স্থান—বন্দর—অবতরণের ঘাট—সেতু—বনভূমি রক্ষা—পয়ঃ প্রণালী খনন—স্বাস্থ্য রক্ষার্থ উপায়াবলম্বন—দাতব্য চিকিৎসালয়—ঔষধালয়—পাগলখানা—স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা—কুষ্ঠাশ্রম—মহামারী নিবারণ—চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গবেষণা—জীবনমৃত্যু তালিকা—টীকা।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে সাধারণের উপকারজনক পূর্ত্ত কার্য্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ জনসাধারণই এইগুলি করিয়া থাকেন; কিন্তু, ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃকই এই সকল সাধারণের হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন* দেশ বিশেষে সর্ব্ববিধ ব্যয়সাধ্য লোকহিতকর অনুষ্ঠানের ভার গবর্ণমেন্টের উপরেই পড়ে। প্রজাদের শক্তিতে কুলায় না। অথবা শক্তিতে কুলাইলেও তাহারা চাহেনা। গবর্ণমেণ্ট যদি নিজ ব্যয়ে স্কুল

---

* মিলের "অর্থনীতি" ২য় খণ্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা।

কলেজ হাঁসপাতাল পথ ঘাট ছাপাখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন, তবেই প্রতিষ্ঠা হয় নতুবা ঘটে না। কোথাও বা অর্থাভাবে ঘটে না, কোথাও বা জনসাধারণে এই সকল প্রতিষ্ঠায় উপকারিতা বুঝে না বলিয়া ঘটে না; কোথাও বা জনসাধারণের মিলিয়া মিশিয়া সমবেত হইয়া কাজ করিবার অভ্যাস নাই বলিয়া ঘটে না। যে সকল দেশে রাজশক্তি বহুকাল হইতে নিরঙ্কুশ, প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে রাজ শক্তির অধীন, যেখানে রাজশক্তি জেতৃ জাতির আয়ত্ত, প্রজা বিজিত; রাজার জাতি উন্নত, সুসভ্য, শক্তিশালী, প্রজার জাতি অনুন্নত, অক্ষম—রাজায় প্রজায় বিপুল ব্যবধান; সেই সকল দেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজাকেই সকল কাজ হাতে লইতে হয়।* জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ সম্ভবতঃ ভারতবর্ষকে মনে করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকেই এই সকল ব্যয়-সাধ্য পূর্ত্ত কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছে।

ব্রিটীশ শাসন প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে খুব কম রাজপথ ছিল। "এতদ্দেশীয় কোন রাজা কোন রাজপথ প্রস্তুত করেন নাই। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উল্লেখ যোগ্য রাজপথ ছিল না বলিলেই হয়। দেশীয় শাসনকর্ত্তা পথের দুই ধারে গাছ লাগাইতেন, বিল খাল মাঝে পড়িলে কখন কখন মাটি ফেলিতেন; কোন কোন বড় লোক বা রাজ-পুরুষ যশের আকাঙ্ক্ষায় নিজের ব্যয়ে সেতু প্রস্তুত করিয়া দিতেন।" অন্যান্য ঋতুতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল; বর্ষাকালে তিন চারি মাস জল পথে ব্যতীত দেশ দুর্গম হইত; কিন্তু অন্যত্র বাণিজ্য ব্যবসায় এক রকম বন্ধ হইত; লর্ড ডালহৌসির সময় এই বিষয়ে প্রতিবিধানের প্রচুর আয়োজন হয়। তাঁহার সময়ে উত্তর-পশ্চিমে ও পঞ্জাবে অনেক পাকা রাস্তা ও সেতু তৈয়ার হইয়াছিল।

* স্যার জন্ ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ" ২১২ পৃষ্ঠা।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। গঙ্গার খাল কাটা হইয়াছিল (১৮৫৪)। লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনের শেষভাগে (১৮৬১—৬২) এক বাঙ্গালা প্রদেশেই ১৯৯৪ মাইল বিস্তৃত একাদশ বৃহৎ রাজপথ সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল; দেশ-ব্যাপী রাজপথ হইতে পথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কর্ম্মনাশা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।"*

১৮৪৩ সালে ষ্টিফেনসন্ সাহেব ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট রেল পথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ১৮৪৯ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত এক কোটী টাকার অনধিক ব্যয়ে একটী আদর্শ লাইন খুলিবার যুক্তি করেন। ১৮৫১ সনে বৰ্দ্ধমান ও রাজমহলের মধ্যবর্ত্তী রাস্তার জরিপ করা হয়। পর বৎসর ঐ জরিপ কার্য্য এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। ১৮৫৩ সনে লর্ড ডালহৌসী বিলাতের ডিরেক্টর সভার নিকট ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রেরণ করেন। ডিরেক্টর সভা ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তারের উৎসাহ দানের জন্য পরামর্শ প্রাপ্ত হন। লর্ড ডালহৌসী এই সম্বন্ধে তাঁহার শেষ মন্তব্য ১৮৫৬ সনে পেশ করেন। ১৮৫৮ সালে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল' লাইন খোলা হয় এবং ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে ইহা ৫৪১ মাইল দূরস্থ কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঐ সময়ে আরও দুইটী বড় লাইন খোলা হয়—একটী বোম্বাই হইতে পশ্চিম ভারতে, অন্যটী মান্দ্রাজ হইয়া দক্ষিণ ভারতে; প্রথমোক্তের নাম 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে' এবং শেষোক্তটী 'মান্দ্রাজ রেলওয়ে'। যে মূলধন ব্যয় হইবে ঐ মূলধনের উপর গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৫৲ সুদ

---

* বাক্‌লাণ্ড সাহেব কৃত "লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ বঙ্গদেশ," প্রথম খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা।

দিবেন এই সর্ত্তে বেসরকারী কোম্পানীরা এই দুইটী লাইন খুলিয়াছিলেন *।

রেল লাইনের সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাফ লাইনও ডালহৌসীর সময়েই খোলা হয়। এখন দেশের সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ লাইন চলিয়াছে।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কারণে দেশে নানারূপ জরিপ সম্পাদিত হইয়াছে। ভৌগোলিক, ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসংগ্রহের জন্য ধারাবাহিক অনুসন্ধান হইয়াছে। অধিকাংশই ভারত ইতিহাসে ইংরাজ রাজত্বে সম্পাদিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আকবরের রাজত্বে আইন-ই-আকবরীতে লিপিবদ্ধ যে রাজস্ব, লোক সংখ্যা, এবং শাসিত প্রদেশ সমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এবং সুবা সমূহের বর্ণনাদির বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, উহাই সর্ব্বপ্রথম জরিপ কিন্তু বর্ত্তমানকালের অনুসন্ধানের তুলনায় ঐ গুলির সত্যতা ও সম্পূর্ণতার বিশেষ অভাব ছিল। আকবরের সময়ের অনুসন্ধানের তত্ত্বগুলি কোন মানচিত্রে প্রকটিত হয় নাই; এবং সর্ব্ব প্রথম ও সঠিক মানচিত্র ফরাসী-ভৌগোলিক ডী আনভিল কর্ত্তৃক ১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন লভ্য বিষয়গুলি সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারতীয় ভূগোলের স্রষ্টিকর্ত্তা" রেনেল সাহেব কর্ত্তৃক (ইনি ক্লাইভের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন) পূর্ব্বোক্ত বিবরণী আরও বিস্তৃত হয়। তৎপ্রণীত "বঙ্গদেশীয় মানচিত্র" স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল প্রসূত হইয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুস্থানের মানচিত্র" রূপে প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুইখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র (একখানি মান্দ্রাজের কর্ণেল্ কল্ কর্ত্তৃক এবং অন্য একখানি বোম্বাইয়ের কর্ণেল্ রেনলড্স্ কর্ত্তৃক) প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু ঐ গুলি প্রকাশিত হয় নাই এবং বর্ত্তমানে সেগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

---

* স্যার জন ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ"—২১৫ পৃষ্ঠা।

১৮০০ সনে কর্ণেল্ লাম্বটন্ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে ও প্রতিপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে অভিনব উপায়ে ভৌগোলিক জরিপ প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮০২ সালে ত্রিকোণমিতি প্রণালী অবলম্বনে জরিপ আরম্ভ হয়। ১৮১৮ সালে ঐ জরিপ গবর্ণর জেনেরালের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হয় এবং ঐ কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কর্ণেল লাম্বটন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কার্য্য বর্ত্তমানেও অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই ত্রিকোণমিতি প্রণালী অবলম্বনে ভূমি মাপে পৃথিবীর আকার নির্দ্ধারণে অনেক তত্ত্ব প্রদান করিয়াছে।

রয়াল সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ও অধ্যাপক রুথার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক জরিপ ১৯০১ সনে আরম্ভ হইয়াছে।

মান্দ্রাজের স্থান বিশেষ ও বর্ম্মার অধিকাংশ স্থান ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই স্থান সমূহের বৃত্তান্ত সংঘটিত জরিপ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সংঘটিত হয় নাই। ত্রিকোণমিতি প্রণালী অবলম্বনে ভূমি মাপের এক সঙ্গেই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমোক্তটী দ্বিতীয়টীর সাহায্যকারী হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে যে সকল জরিপাদি হয়, সেই সময়ে ঐ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশিত করা হইত; উহাতে ঐ সকল স্থানের লোক সংখ্যা ঐতিহাসিক ও বর্ণনা মূলক বৃত্তান্ত থাকিত। জরিপ কার্য্য ধীরে ধীরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রথমতঃ দেশীয় রাজ্য সকল ও ব্রিটীশ শাসনভুক্ত কতিপয় প্রদেশে সম্পাদিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে এই সকল কার্য্য ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং গত ত্রিশ বৎসরেই ইহা রীতিমত ভাবে করা হইতেছে। সম্প্রতি ভারতবাসিগণ জরিপ কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে জরিপে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভারতবাসীও দৃষ্ট হয়। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় জরিপ বিভাগও ভারতীয় ও প্রাদেশিক শাখায় বিভক্ত। প্রথমোক্তটী রাজকীয়

ইঞ্জিনিয়ার বা "ভারতীয় সৈন্য' হইতে নির্ব্বাচিত হয়; শেষোক্ত, ঐ বিভাগের উচ্চ পদ খালি হইলে ভারতবর্ষ হইতেই নির্ব্বাচিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত একটী নিম্ন শ্রেণী ও (প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় শাখা) রহিয়াছে।*

১৮৭২ সনে অরণ্য ভূমির মাপের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা ১৯০০ সনে ভারতীয় জরিপ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হয়।

ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধান ও সীমান্ত প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণের জন্য ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশেও কোন কোন সময় জরিপ করা হইয়াছে। ১৮৭৮-৮০ সালের আফগান যুদ্ধ ও "আফগান সীমান্ত কমিশনের" সময় এইরূপ করা হইয়াছিল। সীমান্ত বা সীমান্তের বহির্ভাগস্থ জরিপ-গুলি "সীমান্ত কমিশন" বা "সীমান্ত অভিযানের" সৈন্য বা কর্ম্মচারীদ্বারা সম্পাদিত হয়। নিসালাণ্ড, উগান্দা, আবিসিনিয়া, পারস্য, আফগানিস্থান, তিব্বত, নেপাল, বর্ম্মার উত্তর ও পূর্ব্বসীমান্ত—এগুলি এইরূপ জরিপের অন্তর্ভুক্ত।†

তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ভারতীয়গণের নিয়োগ এবং (যে সকল স্থানে ব্রিটীশ কর্ম্মচারীদের প্রবেশ সম্ভবপর নহে) ভারতসীমান্তের বহির্ভাগস্থ সেই সকল দেশের ভৌগোলিক তত্ত্ব সংগ্রহ সর্ব্বপ্রথমে কাপ্তেন মণ্টোগমারি কর্ত্তৃক কাশ্মীরের জরিপে প্রবৃত্ত কালীন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুকুশ, অক্সাস্ উপত্যকা, ও তুর্কীস্থানে পাঠানদিগকে, এবং তিব্বত ও চীনের সামান্তে ভূটিয়া বা তিব্বতীয়গণকে নিযুক্ত করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।‡

---

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার" ৪র্থ খণ্ড ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

† ঐ ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

‡ ঐ ৪৩২ পৃষ্ঠা।

রাজস্বসংক্রান্ত ভূমির পরিমাণ দ্বারাই স্বভাবতঃ সকল বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হয়। যমুনা নদীর পশ্চিম তীরস্থ দিল্লী, পাণিপথ এবং রোতক জেলায় ১৮২২ সালে সর্ব্বপ্রথমে ইহা আরম্ভ করা হয়। পঞ্জাব, অযোধ্যা, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ এবং বঙ্গদেশে কর্ণেল থুলিয়ারের শাসন কালে ইহা ১৮৪৭ সালে আরম্ভ হইয়া ত্রিশ বৎসর ব্যাপী হইয়াছিল। তিন প্রকারের জরিপ আছে—প্রথম বৃত্তান্ত সংঘটিত জরিপ, দ্বিতীয় গ্রাম্য জরিপ, তৃতীয় বিশেষ বিবরণ সম্বলিত জরিপ। শেষোক্ত জরিপে জেলা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নির্দ্ধারিত হয়। ইহা ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের কয়েকটী জেলায় ও প্রদেশে বেসরকারী জরিপের উপর নির্ভর করিয়া বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজস্ব সংক্রান্ত জরিপ উচ্চ ও নিম্ন দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথমোক্ত মধ্যে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও শেষোক্তে বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এবং বর্ম্মা অন্তর্ভুক্ত। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইপ্রদেশে স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর দ্বারা রাজস্ব সংক্রান্ত জরিপ সম্পাদিত হইয়াছে। প্রথমে ত্রিকোণমিতি প্রণালী অবলম্বনে ভূমি মাপ, বৃত্তান্ত সংঘটিত জরিপ এবং রাজস্বের জন্য জরিপ এই তিনটীই পৃথক ছিল। "সার্ভে-অব-ইণ্ডিয়া" নামে এই তিনটী ১৮৭৮ সালে একত্রীভূত হয় এবং এই বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ সকল প্রকার জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে এবং কর্ম্মচারীগণ "সার্ভেয়ার জেনারেলের" অধীনে স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত জরিপ ব্যতীত আরও কয়েকপ্রকারের জরিপ আছে যথা—(১) সামুদ্রিক জরিপ; (২) ভূতত্ত্ব বিষয়ক জরিপ—এই বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিষয়ক মানচিত্র প্রস্তুত করণ; (৩) উদ্ভিদ তত্ত্ব বিষয়ক জরিপ; ইহা দ্বারা অনেক প্রকার উদ্ভিদ সংগৃহীত

হইয়াছে। এই বিভাগ ভারতীয় গোধূমের উন্নতি, ইক্ষুর কীট নিবারণ এবং কার্পাস প্রস্তুত করণ সম্বন্ধেও গবেষণা করিতেছেন। (৪) পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জরিপ। এই বিভাগ প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ, খনন, শিলালিপি উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ১৯০৫-০৬ প্রায় ১২০০ লিপি উদ্ধার ও আগ্রা, আজমীর, দিল্লী, লাহোরস্থ মোগল-কীর্ত্তি সংরক্ষণে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে।* লর্ড কর্জ্জন পুরাকীর্ত্তি-রক্ষণ সরকারী কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতে ইহা এইরূপ ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

কারখানা ও কল সমূহ ভারতবর্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে একটীও কার্পাসের কল ছিল না। সম্প্রতি নানা স্থানে বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা ও কার্য্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল কলের উৎপন্ন দ্রব্য কেবল ভারতবর্ষে নয়, জাপান, চীন ও এসিয়ার অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। বঙ্গদেশেও পাটের কল বৃদ্ধি পাইতেছে। অবিকৃত পাট ও তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানী কলিকাতা হইতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। উত্তর ভারতের পশমী বস্ত্র উৎপাদনকারী কল সমূহ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কাগজের কলগুলির অবস্থাও ভাল এবং বর্ম্মার চাউল ও কাঠের মিল গুলির কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। খনিজ ও উৎপাদনকারী শিল্প সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইতেছে। একটী সরকারী মন্তব্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—"বঙ্গদেশের বন্দর সমূহে বৈদেশিক বাণিজ্যের বহুল প্রসার হইলেও, খনির ও কারখানার কার্য্যের বিস্তৃতি দ্বারা উক্ত বিদেশীয় বাণিজ্য হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সুদীর্ঘ চিমনী সুশোভিত গঙ্গাতীর হইয়া ভ্রমণ কালে যে নয়নরঞ্জন দৃশ্য দৃষ্ট হয়,

* ১৯০৬-১৯০৭ সালের "ভারতের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি ও অবস্থা" ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

তাহা অঙ্ক দ্বারা বোধগম্য করা সম্ভবপর নহে। চা ব্যতীত ১৮৯১-৯২ সনের ৮৯১টী কারখানা ১৯০০-০১ সালে ১৭১৮তে পরিণত হইয়াছে। এগুলি ৫০ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যে অস্থি চূর্ণকারী কল, সিমেণ্ট উৎপাদনকারী কল, গালার কল, তৈলের কল, চিনির কল, চাউল ও ময়দার কল, রেশমের কল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।" ক্ষুদ্র শিল্পেও আশ্চর্য্যজনক উন্নতি দেখা দিয়াছে।

বঙ্গদেশের শিল্প সম্বন্ধে কামিং সাহেব যে সুবিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বিষয় বিস্তারিত অবগত হওয়া যায়।* উক্ত লেখক বলিয়াছেন ইউরোপীয় মূলধন এবং ইউরোপীয়দিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ও বৃহৎ কল সমন্বিত কারখানাগুলি প্রধানতঃ কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত। ইছাপুরের অস্ত্রের কারখানা, দমদমার বারুদ, কাশিপুরের গোলা, কাঁচড়াপাড়া, বেলিয়াঘাটা, সিয়ালদহ ও চিৎপুরের লৌহাবর্ত্ত যন্ত্রাদি, খিদিরপুরের ষ্টীমার, আলিপুরের বস্ত্র, ভবানীপুরের টেলিগ্রাফের আবশ্যক যন্ত্রাদি, পাটনার অহিফেন ও অহিফেনের জন্য বাক্স,† এবং ডেরী, মেদিনীপুর, কটক ও কলিকাতার খাল নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অনেক শ্রমজীবিকে নিযুক্ত রাখেন এবং বহু পরিমাণে শিল্প উৎপাদনে সাহায্য করেন।

বাঙ্গালা দেশে কত প্রকার শিল্প দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে লোকে তাহা অবগত নহে। দেশের লোকের মূলধন আরও অধিক পরিমাণে এই সকল কারবারে নিযুক্ত হওয়া উচিত। যে সকল কারখানায় অন্যূন পঞ্চাশ জনের কম মজুর নিযুক্ত আছে, সে গুলিও বাদ দিয়া

---

* ১৯০৮ সালের ২৬শে আগষ্টের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য।

† বর্ত্তমানে পাটনা হইতে ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

তালিকা করিয়া দেখা গিয়াছে ১৯০৫ সালে নিম্নোক্ত নানা শ্রেণীর কারখানা বাঙ্গালা দেশে চলিতেছে।

(১) কাপড়ের কল, সূতার কল, পাটের ও চটের কল, দড়ির কারখানা, রেশম কুঠি।

(২) কয়লার খনি, লোহার খনি, অভ্রের খনি, অভ্র পরিষ্কার করিবার কারখানা, সোরার কারখানা, পিতল, কাঁসার কারখানা।

(৩) নৌকা, ষ্টীমার, রেলওয়ে কারখানা, ট্রামওয়ে কারখানা।

(৪) হাড়ের গুঁড়া, সিমেণ্ট, ঔষধাদি দ্রব্য, মদ, দুগ্ধ ও ক্ষীরের দ্রব্য, ময়দা, বরফ, সোডা, লেমনেড, চিনি, গ্যাস, নীল, কেরোসিনের বাক্স, গালা, তেল, কাগজ, মাটির জিনিষ, ছাপাখানা, সাবান, চামড়া, ইষ্টকাদি ইত্যাদি নানাবিধ কারখানা।

ভারতবর্ষের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ, কয়লা, কেরোসিন, লবণ, অভ্র, মাঙ্গানীজ ধাতু, চুণী, পান্না প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত "টাটা লোহকল" শিক্ষিত ও সাহসিক কর্ম্মের কল এবং কার্য্যকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। খনির কাজের সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন।

১৯০১ সালের খনি সংক্রান্ত আইন সমস্ত ভারতবর্ষেই প্রচলিত। ১৯০৬ সালে ৭৫০টি খনির কার্য্য এই আইনের অধীনে সম্পাদিত হইত। ইহার মধ্যে কয়লার খনির সংখ্যা ৩০০এর অধিক, এবং ইহার অধিকাংশ বঙ্গ-প্রদেশে অবস্থিত।

খনির কাজ, বিশেষতঃ কয়লার খনির কার্য্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। খনির মজুরেরা এতকাল অবসর মত অন্যান্য কাজেও জীবিকা সংগ্রহ করিত। আজ কাল খনির কাজ এত বাড়িয়াছে যে তাহারা খনির কাজেই আবদ্ধ থাকে, অন্য-কার্য্য করিবার অবসর

পায় না। এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারতবর্ষে খনির কার্য্যে ব্রতী থাকার জন্য এক জাতি উদ্ভূত হইতেছে এবং ভারতবাসীরা বহু খনিজ কার্য্যে সুকৌশল শিক্ষা করিতেও সক্ষম।*

ভারতবর্ষে অনেক জমি পতিত আছে। পতিত জমি কৃষিযোগ্য করিবার জন্য ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতেই নানা চেষ্টা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রজাগণকে নানারূপে উৎসাহ দিয়া থাকেন।

পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য পল্লীগ্রামের লোকে মুখ্যতঃ কূপ ও পুষ্করিণী ব্যবহার করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট স্বব্যয়ে কূপ ও পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করেন নাই। বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা অর্জ্জন করেন এবং গবর্ণমেণ্ট কোন কোন সময় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রভৃতিকে এই সকল কার্য্য সম্পাদনে বাধ্য করিয়া থাকেন।

জলপথে বা স্থলপথে যেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থান দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছেন; কলিকাতার ও বোম্বাই নগরের বন্দরে জাহাজের জন্য পোতাশ্রয় তৈয়ারী হইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাই ব্যতীত মান্দ্রাজ, করাচি ও চট্টগ্রামে বন্দর আছে। কলিকাতার দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার নামক বন্দর রহিয়াছে। জাহাজের আশ্রয়ের ও জাহাজ হইতে নামিবার ঘাটের ব্যবস্থাও সকল বন্দরে রহিয়াছে। গঙ্গা, যমুনা, শোন, হুগলী, পদ্মা প্রভৃতি বৃহৎ নদ নদীর উপরে বৃহৎ বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বন আছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এই বন রক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। এই সকল বনে বড় বড় গাছ জন্মে;

* "১৯০৬-১৯০৭ সালের ভারতবর্ষের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির অবস্থা," ১১৫ পৃষ্ঠা।

তদুৎপন্ন বাহাদুরি কাষ্ঠ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। সমুদয় বনভূমি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি এবং ইহাতে দেশের প্রচুর লাভ হয়। পূর্ব্বে যে কোন ব্যক্তি লাভের প্রত্যাশায় এই সকল গাছ কাটিয়া লইত। বনের জমি কৃষি যোগ্য করিবার জন্য ঘাস ও জঙ্গল পোড়াইতে গিয়া দাবদাহে বন ধ্বংস করিত। হিমালয় পর্ব্বতের পৃষ্ঠস্থিত ভূমির বন কর্ত্তিত হওয়ায় পার্ব্বত্য নদীর স্রোতের বেগ বাড়িয়া নিম্নস্থিত সমভূমি পর্য্যন্ত বন্যায় নষ্ট হইতেছিল। এখন গবর্ণমেণ্ট বন রক্ষার সুব্যবস্থার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বন রক্ষার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশেরও অনিষ্ট নিবারিত হইয়াছে।*

উত্তর-ভারতে যেখানে পয়ঃপ্রণালী অত্যাবশ্যক ছিল তথায় সুবৃহৎ পয়ঃপ্রণালী সমূহ খনিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব বৃহৎ বৃহৎ খাল দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে এবং এই সকল খাল এই দুই নদীর জল বণ্টন করে। দুইটী বৃহৎ খাল গঙ্গার জল বণ্টন করে এবং হিমালয় হইতে যমুনা কর্ত্তৃক আনীত সমুদয় জল তিনটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র খালদ্বারা বিতরিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের খাল অপেক্ষা ভারতবর্ষের এই সকল খাল বড়। বিহারের শোন নদী হইতে পয়ঃপ্রণালী সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশে খালের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। উড়িষ্যায়ও আবশ্যকীয় খাল সমূহ রহিয়াছে। পঞ্জাবে সিরহিন্দ খাল শতদ্রুর জল বণ্টন করে এবং চেনাবেরও একটী খাল আছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে হ্রদ বা জলাশয়ের জল আছে। মান্দ্রাজে গোদাবরী ও কৃষ্ণার জল ব্যবহারের জন্য একটী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়াছে; ইহা যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে প্রচলিত প্রথা হইতে বিভিন্ন।

* চেসনীর "ভারতীয় রাজনীতি," ১৬০ পৃষ্ঠা।

"এই তিন নদী উচ্চ ভূমির উপর প্রবাহিত; সাগর সঙ্গমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নিম্ন ভূমি হইতে নিম্নতর সমভূমিতে নদী নামিয়া "ব" দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। সমভূমিতে নামিবার সময় নদীর মুখে বাঁধ দিলে নদীর প্রবাহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পাশ দিয়া নূতন খাতে চলিয়া যায়। এই নূতন খাতের প্রবাহ কৃষির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে নৌকাও চলিতে পারে।"* ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে এইরূপে প্রায় ৪৬০০০ মাইল খাল এ পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে। এবং এই খালের জলে প্রায় ১৭ কোটী একর অনুর্ব্বর ভূমি কৃষিযোগ্য হইয়াছে। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এখনও নিপতিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ লর্ড কর্জ্জন এবিষয়ে যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এই প্রকার আরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগ মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়, ঔষধাগার ও বাতুলালয় স্থাপিত হইয়াছে। জন্ম মৃত্যু তালিকা, সাধারণ স্বাস্থ্য, টীকা, চিকিৎসা-আইন, রোগবীজ পরীক্ষা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদেশ হইতে কোন সংক্রামক ব্যাধি দেশে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সতর্ক আছেন; সকল স্থানে বৈদেশিক জাহাজ হইতে যাত্রী ও নাবিককে নামিতে দেওয়া হয় না, পরীক্ষার পর নামিতে দেওয়া হয়। রোগমুক্তি ও শুশ্রূষার জন্য প্রধান নগর সমূহে চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল বহু পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে ১৬৭৯ সালে একটী বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮০০ ও ১৮২০ সালের মধ্যে আরও চারিটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

* চেসনীর "ভারতীয় রাজনীতি," ২২১ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা প্রসিডেন্সি হাঁসপাতাল ১৭৯৫ সালে ও মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতাল ১৮৫২ সালে স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধভাগে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বড় বড় নগরে স্থানীয় লোকের যত্ন দেখিলে ও ডাক্তার পাওয়া গেলে হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরে স্থানীয় চাঁদার পরিমাণানুসারে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার ও অস্ত্রাদি এবং ঔষধ সরবরাহে স্বীকৃত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অনুষ্ঠানের পর হইতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর ভার বহন করিতেছেন। ১৯০২ সালে* ইংরাজ রাজ্যে প্রেসিডেন্সি নগর ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রায় ২৪০০ এবং অন্যের পরিচালিত ৫০০ স্বাধীন চিকিৎসালয় ছিল; তদ্ব্যতীত রেলওয়ে, পুলিশ প্রভৃতি সম্পর্কের প্রায় ৫০০ চিকিৎসালয় ছিল।† এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট অন্যত্র অল্প সংখ্যক চিকিৎসালয়ের ব্যয় ভার বহন করেন; অন্যান্য সকল প্রদেশে চিকিৎসালয় প্রভৃতি মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রতিপালন করেন। কোথাও কোথাও গবর্ণমেণ্ট কিছু সাহায্য করেন এবং ডাক্তার নিয়োগের ভার লইয়া থাকেন; ডাক্তারের বেতন স্থানীয় লোককে দিতে হয়।‡ ১৯০২ সালে এই রূপে সাধারণ চিকিৎসালয় হইতে প্রায় আড়াই কোটি রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। তবে এই সংখ্যাদ্বারা ইহা যেন অনুমান না করা হয় যে ঐ সংখ্যক লোকই চিকিৎসিত হইয়া ছিল; কারণ কেহ কেহ বৎসরে একাধিক বার চিকিৎসিত হইয়াছিল।§ সম্প্রতি স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য

---

* ১৯১০ সালে এই প্রকার ২৬৮৫টী অনুষ্ঠান ছিল।

† "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থ খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা।

‡ ঐ, ৪৬২-৪৬৩ পৃষ্ঠা।

§ ঐ, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

স্ত্রী-চিকিৎসক এবং শিক্ষিত ধাত্রী নিয়োগ এবং স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে এতদ্দেশীয় ধাত্রীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্বক গবর্ণর জেনেরাল ডফরিনের সহধর্ম্মিণী কাউন্টেস ডফরিন্ কর্ত্তৃক ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় স্ত্রী লোক দিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য জাতীয় সমিতি" দ্বারা এইদিকে অনেক কাজ হইয়াছে। এই সমিতি স্বেচ্ছাদত্ত দান•ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাময়িক সাহায্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়। সমিতি দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসালয়েও নিজ নিজ গৃহে ১৯০১ সনে প্রায় কুড়ি কোটী স্ত্রীলোক ও শিশু চিকিৎসা-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯০১-০২ সনে লেডি কর্জ্জন কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় ধাত্রীগণের শিক্ষার্থে প্রায় সাত লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল।* লেডি মিণ্টো, শুশ্রূষাগারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন এবং লেডি হার্ডিং ভদ্রশ্রেণীর জন্য (যে শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণ চিকিৎসালয়ে যাইতে অনিচ্ছুক) "কটেজ হসপিটালে" বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। লেডি হার্ডিং দিল্লীতে স্ত্রীলোকদের জন্য একটী মেডিকাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পশু-চিকিৎসালয় সমূহও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার আবশ্যকতারও উপলব্ধি হইতেছে। ভ্রমণকারী পশু-চিকিৎসক সকলও নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া পশু সমূহের চিকিৎসা করেন। এই সকল চিকিৎসক ১৯১১-১২ সালে ৯৭,৬৭৪টী গ্রাম পরিদর্শন করিয়া ৪৬৪,৭৩৬ পশুর চিকিৎসা করেন। পীড়িত ও অসমর্থ পশ্বাদির জন্য দয়ালুব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পিঁজরাপোল সমূহ

---

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার" ৪৬৫ পৃষ্ঠা। ১৯১১ সালে কেবল স্ত্রীলোকদের জন্য ১২৮টী চিকিৎসালয় ছিল।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গৃহপালিত পশুদের রক্ষা ও উন্নতি বিধানার্থ বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

১৮৫৮ সনের বিধি অনুযায়ী বাতুলালয় সমূহের ব্যবস্থা করা হয়। উপরোক্ত বিধি দ্বারা বাতুলদিগের ভর্ত্তি ও মুক্তি এবং পরিদর্শক দ্বারা ঐ সকল বাতুলালয়ে পরিদর্শন সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা হয়। সকল বাতুলালয়ই গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাধীন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ, যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে বৃহৎ বৃহৎ বাতুলালয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর অধীনে স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র গুলি কমাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯১১ সনের আদমসুমারিতে দেখা গিয়াছে যে ৩১৫ কোটী ব্যক্তি মধ্যে ৮১০০৬ জন লোক পাগল।*

কুষ্ঠরোগগ্রস্তদিগের শুশ্রূষার জন্য কতিপয় আশ্রম আছে। ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীর অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য ১৮৯০-৯১ সালে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। কুষ্ঠ রোগীরা প্রকাশ্য রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে না পায়, সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহার্য্য দীঘি কূপ ইত্যাদি ব্যবহার না করে এবং খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়াদি কর্ম্মে লিপ্ত হইতে না পারে এ বিষয়ে প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা করিতে উক্ত কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত কুষ্ঠাশ্রমের সংখ্যা ৭৩ এবং প্রায় ৫০০০ কুষ্ঠগ্রস্থ ব্যক্তি এই সকল স্থানে বাস করে।†

---

* নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বাতুলের সংখ্যা পরিলক্ষিত হইবে—

১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
৮১০০৬	৬৬২০৫	৭৪২৭৯	৮১১৩২
২৬	২৩	২৭	৩৫

লক্ষের মধ্যে। ১৯১১ সনের "আদম সুমারির রিপোর্ট," দশম অধ্যায়।

† ঐ, ৪৬৬ পৃষ্ঠা

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে মহামারীর প্রতীকার। কলেরা, বসন্ত, সংক্রামক জ্বর আরম্ভ হইলেই রোগীর শুশ্রূষা, রোগের গতি নিবারণ এবং উক্ত মহামারীর কারণ ও ইতিহাস নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন।* প্লেগ, বেরিবেরি এবং কালাজ্বর নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। চিকিৎসা ও রোগবীজ পরীক্ষা মূলক বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কশৌলির পাস্তুর বিদ্যালয় (যথায় ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি দ্বারা দষ্ট ব্যক্তিগণ চিকিৎসিত হয়) বেসরকারী বন্দোবস্তাধীন হইলেও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হয়। কশৌলি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীর চিকিৎসার্থ ১৯০৭ সালে মান্দ্রাজের কনূর নামক স্থানে আর একটী এই জাতীয় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ম্মাতেও এইরূপ একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জন্ম মৃত্যুর তালিকা রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বসন্ত নিবারণের জন্য টীকা দেওয়া অবশ্যকরণীয় হইয়াছে। ওলাউঠা, প্লেগ, ডিপথেরিয়া ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জন্য টীকা দেওয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তী সমূহের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কলিকাতায় বহু জনাকীর্ণ স্থান সমূহের উন্নতির জন্য ১৯১১ সালে বোম্বাই নগর কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯১২ সালের ২রা জানুয়ারী কলিকাতার উন্নতি বিধায়িনী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্লেগের মহামারীর প্রতীকার ও কারণ নির্ণয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিস্তর ব্যয় ও যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন।

---

* ১৯১১ সালের "আদম সুমারির রিপোর্ট," দশম অধ্যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রজার অধিকার

নাগরিক অধিকার—ভারতীয় "সিভিল সার্ব্বিস"—উহার বিভাগ—উক্ত সার্ব্বিসে ইংরাজ ও ভারতবাসীর পরিমাণ—কয়েকটী অত্যুচ্চ পদে ভারতবাসীর অধিকার—চিকিৎসা বিভাগ—পূর্ত্ত বিভাগ—ব্যবসায়—আইন, চিকিৎসা, পূর্ত্ত—অবৈতনিক পদ—আবেদন ও সভা আহ্বান করিবার অধিকার—উক্ত অধিকারের সঙ্কীর্ণতা—মুদ্রাযন্ত্র—উহার স্বাধীনতা —মুদ্রাযন্ত্রের বৃদ্ধি—প্রজার অধিকার ভোগের নিয়ম।

প্রজার অধিকার সম্বন্ধে ভারতবাসী ও ইংরাজ—এই উভয় প্রজার অতি সামান্য বিভিন্নতাই দৃষ্ট হয়। নির্ব্বাচন বিষয়ে ইংরাজগণের ভারতবাসী অপেক্ষা বিশেষ কোন অধিকার নাই। বিচার কার্য্যে, আইনের চক্ষে, ইংরাজের ভারতবাসী অপেক্ষা কোন বিশেষ স্বত্ব নাই। ব্যবসায়ে ও কার্য্যে প্রবেশাধিকারে ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়েরই তুল্যাধিকার। স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশে ইংরাজ ও ভারতবাসী একই নিয়মের অধীন। সাধারণের অভিযোগ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে ইংরাজ ও ভারতবাসী—উভয়েই একই প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রজার অধিকার সম্বন্ধে ইংরাজ ও ভারতবাসী যে একই ক্ষেত্রে তুল্যাধিকারী তাহাই নহে। ইংলণ্ডে ইংরাজগণ যেরূপ অধিকার ভোগ করেন, ভারতবাসিগণ এতদ্দেশে প্রায় সেইরূপ অধিকার ভোগ করেন এবং মোটের উপর অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা ভারতবাসী অধিকতর স্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণই রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম সম্পাদন সংক্রান্ত উচ্চপদ সমূহ ভোগ করেন। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির ডিরেক্টরেরা স্বেচ্ছামত সিভিল সার্ব্বিসের কর্ম্মচারীদিগকে বিলাত হইতে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। ১৮৫৩ সালে ডিরেক্টরদিগের এই ক্ষমতা উঠিয়া যায়। তদবধি প্রকাশ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে কোন ব্রিটীশ প্রজা এই প্রকাশ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিভিল সার্ব্বিসে নিয়োগ পত্র পাইতে পারেন। পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ এবং ভারতবাসীকে ইংরাজের তুল্য অধিকার প্রদান বিষয়ে যে কমিশন মত দেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত লর্ড মেকলে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কেবল সিভিল সার্ব্বিসভুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য যে সকল পদ রহিয়াছে, তাহা একটী ইংরাজী আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।* গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিগণ, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর ও সেক্রেটারি প্রভৃতি উচ্চতম রাজ-কর্ম্মচারীগণের নিয়োগ এই সিভিল সার্ব্বিস হইতে হয়। এই গুলির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি, হিসাব বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী, জজ, জিলা সমূহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরগণ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য ও সেক্রেটারিগণ, রেভিনিউ কমিশনার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

সিভিল সার্ব্বিস তিন ভাগে বিভক্ত ; যথা (উচ্চতম) ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস—এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ বিলাতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন ; এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক ও নিম্ন বিভাগীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ অধিকাংশই ভারতবাসী হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। প্রাদেশিকগণ প্রধান প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহক, বিচার ও শাসন সংক্রান্ত পদগুলি ভোগ করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদগুলি নিম্নবিভাগস্থ কর্ম্মচারীগণ ভোগ করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ভারতীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ অত্যন্ত অযোগ্য ও অসাধু ছিল এবং তিনি যে নূতন বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে সকল প্রধান

* সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ আইন (১৮৬১ সাল।)

পদগুলিই ইউরোপীয়গণকে প্রদান করা হয়। শিক্ষা-বৃদ্ধি ও ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের সুদৃষ্টান্ত ও শাসনে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ব্রিটীশ শাসনের ইহাও একটী অতি সন্তোষজনক ফল। সুদক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয়গণ শাসন কার্য্যে আরও অধিকতর ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে নিম্ন শ্রেণীস্থ কার্য্যনির্ব্বাহক, শাসন ও বিচার বিভাগের অধিকাংশ পদই এতদ্দেশীয়গণ ভোগ করিতেছেন।*

স্যার জন ষ্ট্রাচী ১৯০৩ সালে লিখিয়াছিলেন "৮৬৪টী পদ সাধারণতঃ ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসের কর্ম্মচারীগণ ভোগ করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ (যাহার সকলগুলিই এতদ্দেশীয়ের অধিকারে রহিয়াছে) ব্যতীত শাসন ও বিচার বিভাগে প্রায় ৩৭০০ কর্ম্মচারী আছেন এবং ইহার মধ্যে মাত্র একশত জন ইউরোপীয়। রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমি সংক্রান্ত নানারূপ কার্য্য এতদ্দেশীয়গণই সম্পন্ন করেন। শাসন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহারা নির্ব্বাহ করেন। আপিল আদালত ভিন্ন নিম্ন আদালতের বিচার-কার্য্য দেশীয় লোক দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সকল হাইকোর্টেও এতদ্দেশীয় লোক বিচারপতি পদে নিযুক্ত আছেন। শাসন ও বিচার কার্য্যে নিযুক্ত দেশীয় রাজপুরুষদিগকে যেরূপ উচ্চ বেতন দেওয়া হয়, এক ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের কোন দেশেই সেরূপ বেতন দেওয়া হয় না।"+

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন কয়েকটী বিভাগে সহকারী সেক্রেটারি ও সেক্রেটারির কার্য্যে দেশের লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে একজন ভারতীয়

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," ৪র্থ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।
+ ষ্ট্রাচীর 'ভারতবর্ষ,' ৮৩ পৃষ্ঠা।

সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সম্প্রতি একজনের হস্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার কর্ত্তৃত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরের পদে বাঙ্গালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। "সেক্রেটারি অব ষ্টেটের" সভায় দুইজন ভারতবাসী সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধির সভায় একজন ভারতবাসীর হস্তেই আইন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব প্রদত্ত হইয়াছে এবং বঙ্গ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বিহারের "শাসন-সভায়" (Executive Council) ভারতবাসী সদস্য হইয়াছেন। (এই বিষয় পরে আরও বিষদরূপে আলোচিত হইবে।) একাধিক ভারতবাসী "এডভোকেট জেনারেল" (Advocate General) ও "ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল" (Standing Counsel) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস-চ্যানসেলার" পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টে ছয় জন ভারতবাসী জজের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং লর্ড হার্ডিং একজন বেসরকারী ভারতবাসীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস-চ্যানসেলার" রূপে মনোনীত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

ব্রিটীশ-শাসিত ভারতবর্ষে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হয়:—ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস, ভারতীয় মেডিকাল সার্ব্বিস, বেসামরিক ও সামরিক এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, এবং সামরিক হাসপাতাল এসিষ্টাণ্ট। সর্ব্বোচ্চ "ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিসেও" ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। মুখ্যতঃ ইহা সামরিক কার্য্য এবং এই দলস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ সৈন্যদলভুক্ত। সামরিক এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা সাধারণতঃ ইউরোপীয় বা ইউরেসীয়। বেসামরিক এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও হসপিটাল এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা অধিকাংশই ভারতবাসী।

ইঞ্জিনিয়ারের পদে প্রবেশ পক্ষে এ দেশের লোকের কোনরূপ নিষেধ নাই। তবে ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের প্রধান পদগুলি ইউরোপীয়দিগেরই

অধিকৃত; বিলাতের ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি এই সকল কাজ পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণের শিক্ষার্থ বিলাতে "কুপার হিল" নামে কলেজ ছিল; উহা এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বাড়ী ঘর, রাস্তা, সেতু, রেলওয়ে, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও তত্ত্বাবধান ইঞ্জিনিয়ারদিগের হস্তে। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই বিভাগে কতকগুলি উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সেই দিন একজন বঙ্গবাসী বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে (প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও সেক্রেটারী) অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক ইঞ্জিনিয়ারগণ ভারতবর্ষেই শিক্ষিত এবং ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই বিভাগের কর্ম্মচারী ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত উচ্চ বিভাগেও কর্ম্ম পাইতে পারেন। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতেই নিম্ন শ্রেণীস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারভাইজারগণ নিযুক্ত হন। আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ সরকারী চাকুরী করিবার সময় স্বাধীনভাবেও স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট কেবল যে এরূপ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন তাহা নহে; বরঞ্চ এরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্দেশবাসীর যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে অনভিমত ছিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী একটী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালেও ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাবহারিক শিল্প শিক্ষায় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

আইন ব্যবসায়ীরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত:—যথা ব্যারিষ্টার, হাইকোর্টের উকীল, নিম্ন আদালতের উকীল ও মোক্তার। ভারতবাসীদের পক্ষে ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়ন সর্ব্বদাই অবারিত রহিয়াছে এবং দীর্ঘকাল হইতে আইনসংক্রান্ত সকল বিভাগেই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কতকগুলি নির্ব্বাচিত উকীলগণকে ব্যারিষ্টারের অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে। অন্যত্র এ ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

কেবল শিক্ষিত ও উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গেরও চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। যাঁহারা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন নাই এরূপ ব্যক্তিও পূর্ত্তসংক্রান্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন। তবে ১৯১২ সালে বোম্বাই প্রদেশে "মেডিকাল অ্যাক্ট" নামক একটী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বৈদ্য ও হাকীম ব্যতিরেকে অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের একটী তালিকা প্রস্তুত ও একটী মেডিকাল কৌন্সিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। বঙ্গদেশেও এইরূপ একটী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কতকগুলি পদ আছে, যাহার অধিকারিগণ কোনরূপ বেতন পান না; তবুও এইগুলি বিশেষ সম্মানের পদ ও দায়িত্বপূর্ণ। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, আইন প্রণয়নকারী সভার সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো— এইগুলি উপরি উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। যদিও এই সকল পদপ্রার্থিগণের কথঞ্চিৎ গুণাবলী থাকা আবশ্যক তথাপি এই সকল পদ সকলের পক্ষেই অবারিত।

প্রজাগণের নানারূপ অভাব দুঃখ থাকে, প্রজাগণ অনেক সময় নূতন অধিকার পাইতে চাহে। এই জন্য প্রজাগণ কখনও বা রাজপুরুষের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হয়; কখনও বা অনেকে মিলিয়া সভাস্থ হইয়া আপনাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে; কখনও বা পুস্তক পত্রিকা লিখিয়া অভাবের বা দুঃখের বিষয়ে আলোচনা করে। কিন্তু এইরূপে রাজার সমীপে অভাব অভিযোগ জানাইবার অধিকার পর্য্যন্ত রাজা সকল সময়ে দিতে চাহেন না। এমন কি ইংলণ্ডের মত দেশেও প্রজাগণকে বহুদিনের চেষ্টায় এই সকল অধিকার অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে

ইংরাজের রাজ্যে প্রজাগণের এই সকল অধিকার পাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ইংলণ্ডীয় প্রজার যে সকল অধিকার, ভারতীয় প্রজার ও সেই সকল অধিকার আছে;—উহা রাজা প্রজা উভয় পক্ষই যেন প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারতের প্রজারা যখন ইচ্ছা রাজপুরুষগণের নিকট আবেদন করিতে পারে, প্রকাশ্য সভায় মিলিত হইয়া আপনাদের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে পারে, রাজপুরুষগণের কার্য্য প্রণালীর সমালোচনা করিতে পারে, পুস্তকে বা সংবাদপত্রে রাজনীতি সংক্রান্ত সকল বিষয়েই মতামত প্রকাশ করিতে পারে। তবে সকল কার্য্যেই কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা আবশ্যক; ইহা সকল দেশেই করিতে হয়। কোন আবেদন পাঠাইতে হইলে তাহার ভাষা সংযত হওয়া আবশ্যক, কোন্ রাজপুরুষের নামে ঐ দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে, কাহার হাত দিয়া দরখাস্ত যাইবে, ঐ সমস্তই নিয়মানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। নতুবা সেই আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। প্রজারা প্রকাশ্য সভায় মিলিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সভায় মিলিয়া গোলযোগ করিতে পারে না। কোন বে-আইনি কাজ করিতে পারে না। সেরূপ করিতে গেলে ক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজপুরুষদের আদেশে সভা বন্ধ করা হয়।

ইংরাজ রাজ্যের পূর্ব্বে এদেশে সংবাদ পত্র ছিল না। ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনেক দিন পরে এদেশে সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রিটীশ শাসনের পূর্ব্বে প্রজাগণের সম্মিলিত কোন মত ছিল না অথবা সাধারণ বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবারও কোন মুখপত্র ছিল না। ব্রিটীশ রাজত্বে এবং ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে এইদেশে সংবাদপত্রের প্রচার হইয়াছে। সংবাদপত্র লেখক যে রাজত্বের সমালোচনা করেন, তিনি সেই রাজত্বের জন্যই উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রজা যে শাসনকর্ত্তার কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতে

সমর্থ এবং প্রকাশ্যে ফলাফল প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ ভাব ইংরাজগণ হইতেই সম্ভূত। প্রথম দৃষ্টান্ত ইংরাজই প্রদর্শন করেন। শ্রীরামপুরের ইংরাজ মিশনারিরা ১৮১৮ সালের ৩১ শে মে প্রথম বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন।* তৎকালে লর্ড ময়রা গবর্ণর জেনারল ছিলেন। অন্যান্য চিঠিপত্র ডাকে পাঠাইতে যে ডাকমাশুল লাগিত, তাহার সিকি ডাকমাশুল নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি এই সংবাদ পত্রের বহুল প্রচারে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রের উপরও উপরোক্ত অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন এবং লর্ড ওয়েলেসলীকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "সেনসরসিপ" উঠাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদকগণ যে সকল বিষয় আলোচনা করিতেন বা যে সকল ব্যক্তির কার্য্যাবলী সমালোচনা করিতেন তিনি তৎপ্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা কোনরূপ নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই, সম্পাদকগণকে নির্ব্বাসন করিতেন। কিন্তু, সুপ্রীম কোর্ট "কলিকাতা জার্ণালের" মোকদ্দমার সময় এরূপ ভাবের অপরাধের বিচার করিতে অস্বীকার করিলেন এবং গবর্ণর জেনেরালও স্বীয় শাসনের সমালোচনার জন্য একজন সম্পাদককে নির্ব্বাসন করিয়া কলঙ্কভাগী হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। সুতরাং উপরোক্ত বিধি আর কার্য্যে পরিণত হইল না এবং প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংঘটিত হইল।† তথাপি ১৮৩৫ সালের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হয় নাই। ঐ সালে গবর্ণর জেনেরাল স্যার চার্লস মেটকাফ্, লর্ড মেকলের বিশেষ প্ররোচনায় সম্পাদকগণের নির্ব্বাসন দণ্ড রহিত করেন। লর্ড লিটনের আমলে, ১৮৭৮ সালের আইন দ্বারা দেশীয় ভাষার লিখিত সংবাদ পত্র সমূহ কতক

---

* "হিন্দুসভ্যতা," তৃতীয় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।
† ঐ তৃতীয় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

গুলি কারণে শাসন বিভাগ দ্বারা দণ্ডনীয় হইয়াছিল এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী কোন মুদ্রাযন্ত্রের ছাপাখানা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে এইরূপ বিধি হইয়াছিল। লর্ড রিপন এই বিধি উঠাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন একটী আইন প্রণয়ন হইয়াছে।

এখন ভারতবর্ষে সংবাদ পত্রের সংখ্যাও অনেক, প্রতিপত্তিও প্রচুর। ১৯০১-২ সালে ভারতবর্ষে সংবাদ পত্রের সংখ্যা প্রায় ৭০০ ও অন্যান্য সাময়িক পত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০০ ছিল। ১৯০১-০২ সালে ৭০৮ ছিল ; ১৯০৭-৮ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫৩ কিন্তু ১৯১১-১২ সালে ইহা হ্রাস পাইয়া ৬৫৯এ পরিণত হয়। সংবাদ পত্র সমূহ সকল বিষয়ের মতামত প্রকাশে ও সমালোচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীন বলিলে এরূপ বুঝায় না যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে বা প্রকাশ করিতে পারেন। বিচার ও সামাজিক সাম্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে, অন্যান্য প্রকার স্বাধীনতার ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতারও কতকটা সীমা আছে ও থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাপেক্ষা উদারনৈতিক দার্শনিকগণও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য ইহাপেক্ষা অধিক দাবী করেন নাই যে, অপরের স্বত্ব বা স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ; অর্থাৎ, প্রত্যেকের স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতা দ্বারা সীমাবদ্ধ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অপরের সম্মান রক্ষা বা চরিত্রে কলঙ্কারোপণ করা স্বাধীনতার সীমার বহির্ভূত। অপরের নিন্দা করিতেও কাহারও অধিকার নাই। হত্যা-প্ররোচনা করিতেও কাহারও ক্ষমতা নাই। তদ্রূপ, সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরূপোৎপাদন বা বিদ্রোহ উদ্রেক করিতে পারে না। স্বাধীনতার

এই সকল সীমা না থাকিলে, সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না—সম্ভবতঃ সমাজ চলিতে পারে না। ক যদি খয়ের মৃত্যুর জন্য একজনকে উৎসাহিত করিতে চাহে তবে খ ও কয়ের মৃত্যুর জন্য এরূপ করিতে পারে, কারণ সকল ব্যক্তিরই একই প্রকার অধিকার থাকা উচিত; কিন্তু তাহা হইলে অরাজকতা উপস্থিত হয়। সুতরাং, ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন এরূপ কথা বলিলে বুঝিতে হইবে যে ইহা কোন প্রকারে অন্যায়রূপে সীমাবদ্ধ নহে। এরূপ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে এবং অন্যান্য কয়েকটী বিশেষ আইনে এই সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রজার অধিকার সম্বন্ধে একটী সাধারণ তথ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। যখন প্রজাবর্গ কোন একটী অধিকারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন না চাহিলেও এরূপ অধিকার প্রাপ্ত হয়। প্রজাগণ এই অধিকারের অপব্যবহার করিলে ইহা উঠাইয়া লওয়া হয় অথবা উহা সীমাবদ্ধ করা হয়। সকল সভ্যদেশেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রজা সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা পাইতে চাহে; রাজা বা রাজপুরুষেরা সমাজের সর্ব্ব সাধারণের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বাধীনতার মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। প্রজা সর্ব্বত্র সমপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় না। ইংলণ্ডের প্রজার যতটা স্বাধীনতা আছে, অন্য কোন দেশের প্রজার ততটা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংলণ্ডেও প্রজাগণকে বহু চেষ্টায় এবং বহুদিনে এই স্বাধীনতা পাইতে হইয়াছে। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পাইয়াছে এমন নহে। স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে এই স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইতে হয়। তখন স্বাধীনতার সংস্কারের প্রয়োজন ঘটে। কেবল এতদ্দেশে নয়, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সকল স্বাধীন দেশেই ঘটে। যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ ন্যায্যরূপে অধিকার

পরিচালনা করিতে পারে, ততদিনই ইহা তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেওয়া হয় ; চিরকালের জন্য এবং অনিয়মিত ভাবে দেওয়া হয় না। যদি সাধারণ-সভা কেবল রাজদ্রোহীই হয়, তবে অন্য স্বাধীন দেশের ন্যায় এদেশেও সাধারণ সভাধিবেশনের ক্ষমতা লোপ করা হইবে। অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। নূতন অপরাধের জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হয় এবং অধিকারের ব্যভিচার হইলে উহা দমন করিতে হয়। কোন এক ব্যক্তির বা কোন এক শ্রেণীর অধিকারের সহিত অপর কোন ব্যক্তির বা অপর কোন শ্রেণীর অধিকারের সংঘর্ষ অনুমোদনীয় নহে। জনসাধারণের সকলেরই হিতের জন্য উহা প্রদত্ত— সাধারণের অহিতকর হইলে কদাচ সেগুলি সহ্য করা হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

ইংরাজ শাসনের ফল

শান্তি—জীবন ও সম্পত্তির বিপদশূন্যতা—নিয়মের মূল্য—শাসন ব্যবস্থার উচ্চ আদর্শ—গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিভিন্নতা—অধিবাসীবর্গের উপর ফল—জীবন ও চিন্তার গতি—জাতীয় জীবনের উদ্রেক।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় গুলি হইতে দৃষ্ট হইয়াছে যে ইংরাজ শাসন কিরূপ নানা শাখায় বিভক্ত এবং ব্যাপকতা পূর্ণ। ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা যে মহৎ ও পরিস্ফুট উপকার লাভ করিয়াছে তাহা শান্তি। ভারতবাসিগণ ইংরাজকে এই দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং শান্তি লাভ করিবার জন্যই তাহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে শক্তিমান্‌, ন্যায়পরায়ণ এবং দৃঢ়স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিবে। অধিবাসিবৃন্দের সহায়তায় ব্রিটীশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং যখন মুষ্টিমেয় ইংরাজ, স্বল্প সৈন্যসহ এতদ্দেশ শাসন করিতেন এবং ইংলণ্ডে গমনাগমন অত্যন্ত দুরূহ ছিল, তখনও বিদ্রোহের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্যে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে ও শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ, সেরূপ গবর্ণমেণ্ট পাইয়া প্রকৃতই জনসাধারণ সুখী ও কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। অধিক দিন শান্তি সুখ ভোগ করিয়া এ বিষয় এবং যে প্রকারে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে সে বিষয়ে তাহারা চিন্তা নাও করিতে পারে। একজন কার্য্যোদ্দেশে বা আনন্দোৎসবের জন্য পরিজনবর্গ ও সম্পত্তি

ত্যাগ করিয়া কয়েক দিবস বা কয়েক মাসের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইল যে কোন দ্রব্যের বা সম্পত্তির কিছুই অনিষ্ট হয় নাই। পুরুষ বা স্ত্রী পদব্রজে বা যানারোহণে অর্থসহ ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিল। পথিমধ্যে কোন বিপদ্ ঘটিল না; কেহই তাহার কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিল না। গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে শয়ান হইল। এই সকল ক্ষেত্রেই কি কারণে সকলে দেহের ও সম্পত্তির বিপদশূন্যতা বোধ করে? ইহা গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা ও ন্যায়-পরায়ণতা। আইন ও শাসন বিধি এরূপ ভাবে রহিয়াছে যে কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবা মাত্র সে ধৃত হইবে ও বিচার করিয়া তাহার দণ্ড দেওয়া হইবে। এই জন্যই কেবল অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলেই পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকে। যদি আইন অসম্পূর্ণ হয়, শাসন-যন্ত্র ফলদায়ক না হয়, বিচারালয়গুলি বিপথগামী বা অনুপযুক্ত হয় অথবা সমাজে অপরাধীর সংখ্যা অত্যধিক হয়, তবে শান্তি এবং নিয়ম থাকিতে পারে না।

যে উদ্দেশ্যে এতদ্দেশে আইন সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে কিছু কিছু বিবৃত হইয়াছে এবং এই সকল আইন প্রবর্ত্তনের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাও পরে বর্ণিত হইবে। কোন-রূপ উন্নতি সাধন করিতে হইলেই শান্তি অত্যাবশ্যক। যদি কোন জন-সমাজের ব্যক্তিবর্গ চিরন্তন আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকে, অথবা তাহাদের সম্পত্তি বিনাশের আশঙ্কা করে, তবে সেই সমাজে মানসিক উন্নতি বা কোন কার্য্য সম্ভবপর নহে। মন সদাসর্ব্বদাই চিন্তাকুল থাকে, কার্য্যকুশলতা অকর্ম্মণ্য হয়, এমন কি কার্য্য করিবার স্পৃহাও দূরীভূত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সমাজ কোনরূপ মানসিক, নৈতিক,

ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতি কিছুই করিতে পারে না। কোন ব্যক্তির চিন্তা বা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার মানসিক শান্তি থাকা আবশ্যক। জনসাধারণের পক্ষেও এই নিয়ম বর্ত্তে। উন্নতির প্রথমস্তর হইতেছে নিয়মতন্ত্রতা; অনিয়মে কোনরূপে উন্নতি সম্ভবপর নহে।

সকল দেশে কতকগুলি সাধারণ রকমের পাপ আছে। এতদ্দেশে ঠগী ও ডাকাইতী এই দুইটী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। স্ত্রী ও পুরুষের সংগঠিত দলকে "ঠগ" বলিত। ইহারা একাকী বা দলবদ্ধ হইয়া লোকদিগকে শ্বাসরোধ অথবা অন্য প্রকারে হত্যা করিয়া তাহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত। পথিকগণ নির্জ্জনে এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ঠগেরা প্রায়ই কথাবার্ত্তায় বা সহানুভূতি দেখাইয়া বিশ্বাস উৎপাদন করিত ও পরে গলদেশে রুমাল বা গামছা বাঁধিয়া পথিকের প্রাণ সংহার করিত। এই প্রকার অপরাধীর দল একপ্রকার নিঃশেষিত হইয়াছে। "লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও কাপ্তেন স্লীমান্ ঠগীদমনের জন্য বিশেষরূপে প্রশংসার্হ। ঠগীরা পুরুষানুক্রমে পথিকগণকে হত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গোয়েন্দাদিগের সাক্ষ্যের সাহায্যে এই বীভৎস দলসমূহ ক্রমশঃ নির্ম্মূল করা হইয়াছিল।" ডাকাইতী একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারা যায় নাই; তবে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এক সময়ে বঙ্গদেশে ডাকাইতী সাধারণ অপরাধের ন্যায় ছিল। ডাকাইতগণ দলবদ্ধ হইয়া অপহরণ অথবা বলপূর্ব্বক চুরি করিত। ডাকাইতীর সঙ্গে সঙ্গে নরহত্যাও হইত। ঠগী ও ডাকাইতী দমনের জন্য গবর্ণমেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল এবং এক সময়ে ডাকাইতী নিরাকরণের জন্য একটী বিশেষ কর্ম্মচারীও ছিলেন—ইনি কেবল এই অপরাধ দমনের জন্যই ব্যাপৃত থাকিতেন।

কেবল যে দস্যুতা প্রভৃতি বিপজ্জনক অপরাধ দমন করা হইয়াছে, (আইন দ্বারা ইহার নিরাকরণ করা হয় নাই—অপরাধীদিগকে ধৃত ও উপযুক্তরূপে শাস্তি প্রদান করিয়াই এরূপ হইয়াছে) শান্তি ও নিয়ম দেশ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নহে, এমন একটী শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যাহা সাধুতা ও কার্য্যকারিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইবে। ব্রিটীশ শাসনের নৈতিক অবস্থা ও যে প্রকার উৎসাহ এবং কার্য্য-দক্ষতার সহিত ইহা পরিচালিত হয়, তাহা এই শাসনের একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। ইহার ফলে কেবল যে দেশের উন্নতি ও নানারূপ উপকারী কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা নহে, জন সাধারণের আদর্শেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অধিবাসিবৃন্দ শৃঙ্খলা ও সময়-নিষ্ঠতা শিক্ষা করিয়াছে এবং বশ্যতা ও ধারাবাহিক কার্য্য করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে দেশীয় অধস্তন কর্ম্মচারি-বৃন্দ শিক্ষা ও উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টান্তে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণ ইংরাজশাসনে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে তাহারা অন্য কোন প্রকার শাসন সহ্য করিবে না। তাহারা ইংরাজপ্রবর্ত্তিত শাসন আপনাদের শাসন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। নিজেদের কার্য্যে তাহারা ঐ প্রকার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরাজী পদ্ধতি ও আদর্শানুযায়ী তাহারা উন্নতির দাবী করিতেছে। সুতরাং ইংরাজ শাসন ভারতবর্ষে একটী বিশেষ শিক্ষনীয় ক্ষমতা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ইংরাজকে যে পরিমাণ ও যেরূপ বিভিন্ন কার্য্য করিতে হইয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন গবর্ণমেণ্টকেই ঐরূপ করিতে হয় নাই। জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধে শিক্ষাদান হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক

অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান দান পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। কৃষি ও শিল্প শিক্ষার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে ; মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৌথ মহাজনী সমিতি স্থাপন করিতে হইয়াছে ; সুদখোর মহাজন ও অত্যাচারী জমীদারের পীড়ন নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে ; বনভূমি রক্ষা ও খনির কার্য্য করিতে হইয়াছে ; জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা শিক্ষা এবং টীকা লওয়া বা জলসংস্থান বিষয়ে উপদেশ দিতে হইয়াছে ; কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় জ্ঞানলাভে সহায়তা করিতে হইয়াছে ; রাজপথ, সেতু, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণে, দাসত্ব ও শিশুহত্যা নিরাকরণে, জমী জরীপ ও মানচিত্র প্রণয়নের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ও জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান করিতে হইয়াছে ; কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইতেছে ; বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হইতেছে ; প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিতে হইতেছে, অথচ সেইসঙ্গে ব্যাধি প্রভৃতি হইতে পশু ও বৃক্ষাদি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণে দেশের লোকের আদর্শের উন্নতি হইয়াছে। নূতন নূতন বিদ্যা, নূতন কর্ত্তব্য, দেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অভাব বোধের সহিত অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া লইবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে। দরিদ্র কৃষাণ, দরিদ্র কুলি মজুর পর্য্যন্ত জানিয়াছে, যে তাহারও কোন না কোন স্বত্ব, কোন না কোন অধিকার রহিয়াছে, এবং যথা স্থানে আবেদন করিলেই সেই সেই স্বত্ব ও সেই অধিকার লাভ করিবে ; কেহ তাহাকে সে বিষয়ে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। অন্যে তাহার উপর অত্যাচার করিলে, তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার

অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে কোথায় তাহার প্রতীকার হইবে তাহা সে জানিতে পারিয়াছে; মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন বিষয় না বুঝিয়া কেহ মানিয়া লইতে চাহে না। সকল বিষয়ের ভাল মন্দ দুই দিক বিচার করিয়া লয়।

কেহ কেহ বলেন যে সামাজিক হিসাবে এই জাতীয় উদ্দীপনা সম্পূর্ণরূপে সুফলদায়ক নহে অর্থাৎ বাঞ্ছনীয়ও নহে। এই বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ব্রিটীশ শাসনে প্রজাবৃন্দের চিন্তাশক্তি ও কার্য্যক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের বিজ্ঞান, ইউরোপের দর্শন চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া নূতন পথে, নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের সামর্থ্য দিয়াছে। অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রিসভা, ব্যবস্থাপকসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির কার্য্য-সম্পাদনের অধিকার পাইয়া সাধারণের কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার সুযোগ পাইয়া, মনুষ্যের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি স্বার্থ সাধনের সঙ্কীর্ণ পথ ত্যাগ করিয়া পরার্থ সাধনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইতেছে। সমাজকে সংস্কৃত, স্বদেশকে উন্নত ও স্বজাতিকে গৌরবান্বিত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোকের মনে জাগরিত হইয়া এক নূতন জীবন দান করিয়াছে।

সার্দ্ধশত বৎসর ব্যাপী ইংরাজ শাসনের সর্ব্বোত্তম ফল দেশ মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা। এই ফল লাভের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ ও জনসাধারণ উভয়েই গৌরবানুভব করিতে পারেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত; ইহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা দূর হয় নাই বটে কিন্তু ইংরাজাধিকারে ভারতবাসী একই শিক্ষা, একই শাসনতন্ত্র,

একই আইন, একই আদর্শের অধীন হওয়ায় সেই ঐক্যবন্ধন ক্রমশঃ সুসাধ্য হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তনে এই ঐক্যসাধন দ্রুত গতিতে সম্পাদিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষালাভ করিয়াছেন, ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের ভাব, তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার প্রবাহ, একই পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিবিধ সামাজিক ভেদ সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান একত্র বসিয়া একত্র মিলিয়া আপনাদের সাধারণ হিত, সাধারণ স্বার্থ বিষয়ে আপনাদের মত প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিবিধ ভেদ সত্ত্বেও যখন ভারবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্নবেশী, ভিন্নভাষী, ভিন্নধর্ম্মী, নেতৃবৃন্দ সাধারণ হিত সাধনের জন্য একত্র সম্মিলিত হন, তখন যেন ভারতবর্ষে এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে, এই কল্পনা তাঁহাদের হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দিত করিয়া তুলে। ইংরাজী শিক্ষাই ইহাদিগকে একত্রীভূত করিয়াছে। তাঁহারা ইহাও অনুভব করেন যে, সেই শিক্ষার বলেই তাঁহারা অধস্তন জনসমবায়কে উন্নত করিতে পারিবেন এবং অবশেষে সামাজিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষ এক জাতিতে পরিণত হইবে। এই প্রকার জাতীয়তা রাজনৈতিক সহানুভূতি দ্বারা (জাতি ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা সত্ত্বে) সম্ভবপর হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, যে একতা-ভাব ব্রিটীশ রাজত্বের শিক্ষার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াছে তাহা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইবে। স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির সহিত জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতাও পরিপুষ্ট হইবে ; এবং শাসনকর্ত্তা ও অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পর অধিক পরিমাণে বিশ্বস্ততা স্থাপিত হইলে অধিবাসিবর্গ নিশ্চয়ই সামরিক বিভাগেও যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ইংলণ্ড

ও ভারতবর্ষ একত্র হইয়া কি যুদ্ধে কি শান্তিতে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একটী প্রধান দেশে পরিণত করিবে।* ভারতীয় জীবনের সামাজিক সমস্যাগুলি বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। অধিবাসীরা নিজ নিজ পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন জনসাধারণ যদি জাতীয় জীবনের অভিলাষ করেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে ইংলণ্ডের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে।

---

* বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা কতক পরিমাণে প্রকটিত হইতেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

শাসন ব্যবস্থা—শাসনের অর্থ—অবস্থা—উদ্দেশ্য—বিভাগ—রাজ্যপালন বিভাগ—সামরিক বিভাগ—ধর্ম্মানুষ্ঠান বিভাগ—রাজ্যপালনবিভাগের অংশ—ব্যবস্থাপ্রণয়ন বিভাগ—বিচার বিভাগ—শাসন বিভাগ—রাজস্ব বিভাগ—প্রধান প্রধান বিভাগীয় কার্য্যনির্ব্বাহক শাখা।

কোন দেশ শাসনের ব্যবস্থাকে অন্য কথায় গবর্ণমেণ্ট বা ইহার শাসন-প্রণালী বলা হয়। সেই দেশে শান্তিরক্ষা ও তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখাই শাসনের অর্থ। যে দেশে আদেশ সমূহ কার্য্যে পরিণত করণে এবং ব্যবস্থিত অনুষ্ঠান সকল সংরক্ষণে সমর্থ সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক কর্ত্তা নাই, সে দেশের শাসন-ব্যবস্থা বা গবর্ণমেণ্ট আছে বলা যাইতে পারে না। এই সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক কর্ত্তা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহ হইতে পারেন। এই ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে অথবা ইহার অধীন কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। দেশ তাঁহার ক্ষমতা স্বীকার, ব্যবস্থা প্রতিপালন ও আদেশ পালন করিবে। একদিকে উপযুক্ত রাজ-নৈতিক কর্ত্তা এবং অন্য দিকে বশ্যতা—গবর্ণমেণ্টের ইহাই নিয়ম।

কোন দেশের শাসনব্যবস্থা এক দিবসে গঠিত হইতে পারে না এবং চিরস্থায়িতাও প্রাপ্ত হয় না। দেশের প্রয়োজনানুযায়ী এবং অধিবাসীদের চরিত্র, ক্ষমতা ও জীবনানুযায়ী সদাসর্ব্বদাই ইহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। অধিবাসিবৃন্দের বৃদ্ধি ও তাহাদের কার্য্যাবলীর আধিক্য অনুসারে ইহা জটিল হয়। সুতরাং ইতিহাসের দিক হইতে ইহা অধ্যয়ন করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কেবল বর্ত্তমান শাসনের সংক্ষিপ্ত

বিবরণ প্রদত্ত হইবে এবং কেবল যে স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ শিক্ষাপ্রদ বোধ হইবে বা বর্ত্তমান শাসন নীতির সহিত উহার ঘনিষ্ঠতা আছে এইরূপ বোধ হইবে, তাহাই উল্লেখ করা হইবে। প্রত্যেক শাসনের উদ্দেশ্যই হইতেছে শান্তিরক্ষা কিন্তু কেবল শান্তিরক্ষা হইতেই কোন শাসনব্যবস্থা পরীক্ষিত হইতে পারে না। নীতিশূন্য নির্য্যাতনকর যথেচ্ছ শাসনতন্ত্রও শান্তিরক্ষা করিতে পারে না এবং সহৃদয় দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্টও শান্তিরক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং কোন এক শাসন-তন্ত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হইলে, যেরূপ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও যে অবস্থায় উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শান্তি ও নিরুপদ্রবতা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, আর্থিক উন্নতি এবং দেশের উন্নতি ও অধিবাসীদের সুখ—রাজনৈতিক শাসনচক্র কি ভাবে এই গুলির ব্যবস্থা করিতে পারে তাহাই দেখিতে হইবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই সকল উদ্দেশ্য সাধনে যে নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন পুস্তকের প্রথমাংশে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ নীতি ও অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শাসনব্যবস্থার যে অনুষ্ঠান সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারই বর্ণনা প্রদান করা হইবে।

ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা (প্রকৃত পক্ষে সকল দেশেরই ব্যবস্থা) মূলতঃ রাজ্যপালন ও সামরিক—এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কোন কোন দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে আরও একটী বিভাগ আছে। রাজ্যপালন বিভাগ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ব্যবস্থাপ্রণয়নবিভাগ, বিচারবিভাগ, ও শাসনবিভাগ। ব্যবস্থাপ্রণয়ন-বিভাগ আইনপ্রণয়ন ও প্রচার করেন; আদালতে যে সকল মোকদ্দমা আইসে বিচার বিভাগ তাহাতে ঐ সকল আইন প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা

করেন ; শাসনবিভাগ শান্তিরক্ষা ও গবর্ণমেণ্টের আবশ্যকীয় কার্য্য করেন। রাজস্ববিভাগ শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে অথবা স্বতন্ত্রভাবে রাজকর বিভাগ বলা যাইতে পারে। অন্য একটীকে —যাহা উপরোক্ত কোন বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না অথচ যাহা এদেশে অত্যন্ত আবশ্যকীয়—প্রধান প্রধান বিভাগীয় কার্য্যনির্ব্বাহক শাখা বা বিভাগ বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও সেরেস্তা অন্তর্ভুক্ত। শাসন বিভাগীয় কর্ম্ম প্রধানতঃ এই সকল সেরেস্তা দ্বারা হইয়া থাকে ; এতদ্ব্যতীত এই সকল সেরেস্তা বিশেষ বিশেষ কার্য্য যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেজেষ্ট্রী প্রভৃতিও সম্পাদন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামরিক শাসনব্যবস্থা

ভারতীয় সৈন্য—বঙ্গদেশ—বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সৈন্যদল—আবশ্যকমতব্যবহার্য্য সৈন্যদল—পঞ্জাব সীমান্তের সৈন্য—সামরিক বিভাগের পরিবর্ত্তন—১৮৮৫ সনে সৈন্য বৃদ্ধি—সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ—১৯০৬ সালের পরিবর্ত্তন—সৈন্য ও রণসম্ভার বিভাগ—শেষোক্ত বিভাগের বিলোপ—প্রয়োজন হইলে ব্যবহার জন্য রক্ষিত কার্য্যক্ষম সৈন্যদল—অতিরিক্ত সৈন্য—দেশীয় রাজগণের সৈন্য—ভারতীয় সৈন্যের কর্ম্মচারী—সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ভারতবাসিগণের অবস্থা পরিবর্ত্তন—দুর্গ ও বন্দর—ভারতের রাজকীয় নৌ-সেনা বিভাগ।

ভারতবর্ষের সামরিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বর্ণনা প্রদত্ত হইলেই চলিবে। ভারতীয় সৈন্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপস্থিত ঘটনার প্রয়োজনানুসারে সৈন্যের শক্তি বৃদ্ধি ও নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৬৬৯ সালের সনন্দ অনুযায়ী বোম্বাইয়ে সর্ব্ব প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় সৈন্যদল গঠিত হয়। সে সময়ে যে সকল কর্ম্মচারী ও সৈন্য তথায় ছিল ও যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রতী হইয়াছিল তাহাদের লইয়াই এই দল গঠিত হইয়াছিল। ফরাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন একদল দেশীয় সিপাহী নিযুক্ত করা হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে কোম্পানির ভারতীয় সৈন্যদল গঠিত হয়।* ঐ সময়ে ক্ষুদ্র একদল ইউরোপীয় সৈন্যও নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সৈন্য দলের অধিনায়ক, মেজর ষ্ট্রিঙ্গার লরেন্সকে ভারতীয় সৈন্যের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক ('The father of the Indian

---

* চেসনি "ভারতীয় রাজনীতি," তৃতীয় সংস্করণ, ২০৫ পৃষ্ঠা।

Army') বলা হয়। ১৭৮১ সালের পার্লিয়ামেন্টের বিধি দ্বারা কোম্পানি সৈন্য নিযুক্ত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং ১৭৯৯ সালের বিধি দ্বারা কোম্পানি ইউরোপীয় সৈন্য নিয়োগ ও তাহাদের শাসনে রাখিবার ভার প্রাপ্ত হন*। ক্রমে ক্রমে বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিন বিভাগেই তিনটী স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত, দেশীয় রাজন্যগণের ব্যয়ে পরিচালিত ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষার জন্য আবশ্যকমত ব্যবহার্য্য সৈন্যদল গঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় সৈন্য মধ্যে বঙ্গদেশীয় কোন সৈন্য অন্তর্ভূত হয় নাই এবং কেবল ইহার অংশ বিশেষই বঙ্গদেশে রাখা হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সম্মিলিত সৈন্য অপেক্ষা বঙ্গদেশীয় সৈন্য অধিক ছিল। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও অযোধ্যার মুসলমান এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় মুসলমান সৈন্য লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে আবশ্যকমত ব্যবহার্য্য সৈন্যদলও এই স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতেই মান্দ্রাজী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। পঞ্জাবের সীমান্ত সৈন্য—অশ্বারোহী ও পদাতিক—স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। গোলন্দাজী সৈন্যের অধিকাংশই ভারতবাসী। ১৮৫৬ সনে কোম্পানির সৈন্য মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত আবশ্যকমত ব্যবহার্য্য সৈন্যদল ব্যতীত ৩৯০০০ ইউরোপীয় ও ২১৫০০০ ভারতীয় সৈন্য ছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। যাহাকে বাঙ্গালার সেনা বলিত, সেই সেনাদলের অন্তর্গত যাবতীয় সৈনিক—হিন্দু ও মুসলমান,—প্রায় একযোগে বিদ্রোহী হয়। নবগঠিত পঞ্জাবের সেনা নিকটে থাকিয়াও এই বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই; বরং বিদ্রোহ দমনে

* ইলবার্টের "ভারত গবর্ণমেণ্ট," ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠা।

প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সেনা এবং হায়দ্রাবাদে রাজ্যরক্ষার্থ নিজামের ব্যয়ে রক্ষিত কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। যখন কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণীর হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হইল, তখন সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করা হইল। বঙ্গদেশীয় সেনা পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল। স্থানীয় ইউরোপীয় সৈন্য লোপ পাইল এবং এতদ্দেশীয় ইউরোপীয় পদাতিকের স্থলে খাস্ ব্রিটীশ সৈন্য নিযুক্ত হইল। গোলন্দাজী সৈন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ব্রিটীশ সৈন্য হইল। ব্রিটীশ সৈন্য ৬২০০০ এ পরিণত হইল ও ভারতীয় সৈন্য হ্রাস করাইয়া ১৩৫০০০ করা হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে দেশীয় সৈন্য পুলিসের কর্ম্ম করিত কিন্তু এক্ষণে পুলিস বিভাগ পুনর্গঠিত হওয়ায়, সিপাহী সৈন্য হ্রাস দ্বারা বস্তুতঃ পক্ষে কার্য্যক্ষম সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা হইল না। কিন্তু তখনও পুরাতন নামে তিনটী স্বতন্ত্র সৈন্য দল রক্ষা করা হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে সামরিক কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বঙ্গীয় পদাতিক সৈন্যে শ্রেণী বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক সৈন্য-দল এক একটী জাতি লইয়া গঠিত। রুশিয়ানদিগের আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া, ১৮৮৫ সালে পুনর্ব্বার সামরিক ব্যবস্থা বিবেচিত হয় এবং ফলে ইউরোপীয় ও সিপাহী সৈন্য বৃদ্ধি করা হয়। ১৯০০ সালে সৈন্য সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২২৩০০০ ছিল এবং ইহার মধ্যে ৭৬০০০ গোরা সৈন্য ছিল।*

ভারতীয় সৈন্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃত্ব আইন দ্বারা মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরালের উপর ন্যস্ত হইয়াছে; ইহার উপরে ভারতসচিব আছেন। উক্ত সভার সামরিক সদস্যের হস্তে সামরিক বিভাগের কার্য্যাবলী ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রধান সেনাপতিই সম্রাটের ভারতীয় সৈন্যের কর্ত্তা;

---

* ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ," ৪৩৭-৪৩৮ ও ৪৪০-৪৪৫ পৃষ্ঠা।

তবে ইনিও মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরালের অধীন। পূর্ব্বে, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এক একজন স্থানীয় সেনাপতি ছিলেন। ১৮৯৩ সালের বিধিদ্বারা ঐ সকল সেনাপতির পদ লোপ করা হয় এবং ঐ সকল সৈন্যের সামরিক কর্তৃত্ব পূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল, এক্ষণে তাহা ভারতগবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ১৮৯৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।*

১৮৯৫ সাল হইতে ভারতীয় সৈন্যকে প্রধানতঃ চারি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের যে যে স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে সেই সেই স্থানের নামানুসারে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে—যথা পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ; ১৯০৩-৪ সালে ব্রহ্মদেশ মান্দ্রাজ হইতে বিভক্ত হইয়া পঞ্চম বিভাগে পরিণত হইয়াছে। এই সকল বিভাগ সামরিক জেলাতে পুনর্ব্বিভক্ত হইয়াছে।

১৯০৪ সালে লর্ড কিচ্‌নার কর্তৃক প্রবর্ত্তিত পুনর্গঠন ও পুনর্ব্বিভাগ অনুসারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামরিক ষ্টেশন উঠাইয়া দিয়া বৃহৎ বৃহৎ সেনানিবাসে সৈন্য একত্রীভূত করা হইয়াছে। আটটী বিভাগীয় সেনাপতিত্ব লইয়া তাহাদিগকে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব এই তিনটী সৈন্যাবলীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেকেন্দ্রাবাদ ও ব্রহ্মদেশ এই দুইটী বিভাগ পূর্ব্বোক্ত অধিনায়কত্বের বহির্ভূত রাখিয়া প্রধান সেনাপতির অধীনে রাখা হইয়াছে।

১৯০৭ সালে আরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই সময় হইতে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব বিভাগের অধিনায়কত্ব লোপ করা হয় এবং ভারতীয় সৈন্যাবলী উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক

---

* ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ" ৪৪৬-৪৪৮ পৃষ্ঠা।

একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হয়। বর্ত্তমানেও এই ব্যবস্থা চলিতেছে।*

১৯০৬ সনে আরও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সম্রাট্ ও তন্নিম্নে মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরালের হস্তে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইলেও পুরাতন সামরিক বিভাগের পরিবর্ত্তে (১) সৈন্য বিভাগ ও (২) রণসম্ভার বিভাগ স্থাপিত হয়।† প্রধান সেনাপতির অধীনে প্রথমটী, দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কার্য্যগুলি ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্ম এবং সেনানিবাস ও স্বেচ্ছা-সেবক সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদন করিত। দ্বিতীয়টী—যাহা কাউন্সিলের একজন সাধারণ সভ্যের হস্তে ন্যস্ত ছিল—সেনাসংগ্রহবিষয়ক চুক্তি, ভারবাহী পশুদিগের সরবরাহ ও তালিকাভুক্ত করা, তোপ, যুদ্ধাশ্ব সংগ্রহ, দুর্গাদি নির্ম্মাণ, সৈন্যগণের পরিচ্ছদাদি, ভারতের রাজকীয় নৌসেনা এবং ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগ সংক্রান্ত কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন।

১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে রণসম্ভার বিভাগ লুপ্ত হয় এবং কামান, ভারবাহী পশু, অশ্ব প্রভৃতি সংগ্রহ কার্য্যের ভার, সেনা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত হয়। ভারত সরকারের হস্তস্থিত রণসম্ভার বিভাগও সৈন্য বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং ভারত সরকারের শাসনাধীনে রাখিয়া সৈন্য সংক্রান্ত সকল শাসনব্যবস্থা প্রধান শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হয়।‡

প্রয়োজন হইলে ব্যবহারজন্য রক্ষিত কার্য্যক্ষম সৈন্যদল—অর্থাৎ যে সকল সিপাহী পাঁচ হইতে দশ বৎসর কাল যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত

---

* পঞ্চম দশম-বার্ষিক রিপোর্ট, ৩৩০ পৃষ্ঠা।

† "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থখণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা।

‡ পঞ্চম দশম বার্ষিক রিপোর্ট ৩৭২, ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে—এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যতীত ভারতীয় সৈন্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত সৈন্য, দেশ রক্ষার্থ অস্থায়ী সৈন্য, সামরিক পুলিস এবং দেশীয় রাজ্য সমূহের অধীন (ও যাহা ঐ সকল রাজ্য সরবরাহ করেন) সৈন্যগণও ("Imperial Service Troops") উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত সৈন্য ব্যতীতও দেশীয় রাজ্য সমূহ পৃথক্ সৈন্য দল রক্ষা করেন। শিখ রাজ্যে ও রাজপুতানায় এই সকল সৈন্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সৈন্য আছে। গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর সৈন্যকে ইহার পরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।* সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে সেনা বিভাগে ভারতবাসীর প্রতিপত্তি বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। সিপাহী সৈন্যের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমান হইয়াছে; ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোককে সহসা সৈনিকের কর্ম্মে লওয়া হয় না; সৈনিক কর্ম্মচারীর উচ্চ পদেও ভারতবাসীকে সহসা নিযুক্ত করা হয় না। এ বিষয়ে স্যার্ জর্জ্জ চেস্‌নি এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:— ভারতবর্ষের অপর সকল বিভাগেই উচ্চ পদে নিয়োগের দ্বার ভারতবাসীর পক্ষে অবারিত আছে; যোগ্যতা থাকিলে কোন উচ্চ কর্ম্মে ভারতবাসীর নিয়োগে বিশেষ বাধা নাই; হাইকোর্টের মত উচ্চতম বিচারালয়ে ভারতবাসী উপবিষ্ট আছেন। কিন্তু সেনাবিভাগের দ্বার অদ্যাপি ভারতবাসীর পক্ষে রুদ্ধ আছে। ভারতবর্ষে সিপাহী সেনা মুখ্যতঃ কৃষক শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। উচ্চ শ্রেণীর লোক প্রায় সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হয় না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর অধীনে সিপাহী সেনা নিযুক্ত আছে। অশ্বারোহী সেনাদলে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীর স্থান আরও নিকৃষ্ট হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্বে ইহারা একটী সৈন্যদলের অধিনায়ক

---

* পঞ্চম রিপোর্ট, ৩৭২ ও ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়স্ক ইংরাজ কর্ম্মচারীকে এতদ্দেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর উপরে অধিনায়কত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেনা বিভাগ সম্পর্কে মহারাণীর ঘোষণা পত্র ব্যর্থ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নানারূপ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন; ইহারা যুদ্ধ-ব্যবসায়কে গৌরবজনক কর্ম্ম বলিয়া জানেন; ইহাদের পিতৃপুরুষেরা ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়া ও রণকুশল সেনা চালনা করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সেনা বিভাগে এই শ্রেণীর যুদ্ধামোদী পদস্থ লোকের, স্থান নাই।" সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে না যে মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করা হইতেছে।*

অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে রাজপ্রতিনিধি ও ভারতসচিব এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন।

দেশ রক্ষার জন্য দুর্গাদি নির্ম্মাণ আবশ্যক। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই বৈদেশিক শত্রুর আশঙ্কা প্রবল। ঐ সীমা রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেখানে যেখানে শত্রু প্রবেশের আশঙ্কা, সেই সেই খানে দুর্গনির্ম্মাণ করা হইয়াছে। রেলপথ দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত ঐ সকল দুর্গের সংযোগ রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগ সমুদ্ররক্ষিত, ঐ সমুদ্রের উপকূল রক্ষার জন্য নৌসেনা অবস্থিত। রণপোতাদির আশ্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে পোতাশ্রয় রহিয়াছে। এবং সেই সকল আশ্রয়স্থান রক্ষার জন্য টর্পেডো বোট প্রভৃতির সমাবেশ আছে; বোম্বাই, সিমলা, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় স্থানে তারবিহান তাড়িতবার্ত্তাবহ স্থাপিত হইয়াছে।

---

* চেস্নি "ভারতীয় রাজনীতি" তৃতীয় সংস্করণ, ২৬৮ পৃষ্ঠ।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়েই ইংরাজের সহিত ফরাসীদের বিরোধ ঘটে; ফরাসীদের রণপোত সমুদ্রে বিচরণ করিয়া ইংরাজের বাণিজ্য ধ্বংশের চেষ্টা করিত। বৃটীশ রণতরী সেই আক্রমণ নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কোম্পানির বাণিজ্যের জাহাজগুলিকেও আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধজাহাজে পরিণত হইতে হইয়াছিল। ঐ সকল জাহাজ পণ্য বহন করিত, আবশ্যক হইলে বিপক্ষের জাহাজের সহিত যুদ্ধও করিত। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ ও দ্বিতীয় জেম্সের সনন্দবলে, কোম্পানি রণতরী নির্ম্মাণের ও রক্ষার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ১৮২৯ সালে বোম্বাই প্রদেশের রণতরী সমূহ বাঙ্গালা প্রদেশের রণতরীর সহিত মিলিত হইয়া ভারতীয় নৌসেনা সংগঠিত হয়। ১৮৬২ সালে ব্যয় সঙ্কোচার্থ এই নৌসেনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে "বোম্বাই নৌসেনা" গঠিত হয় এবং ১৮৭৭ সালে পরিণামে বঙ্গের নৌসেনার সহিত মিলিত হয় এবং ১৮৯২ সালে ইহাকে "ভারতীয় রাজকীয় নৌসেনা" নাম প্রদত্ত হয়। উক্ত রাজকীয় নৌসেনার উপর ভারতবর্ষের বাণিজ্য রক্ষা এবং ভারতবর্ষের উপকূল শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, জলদস্যু দমন করা এবং সৈন্য ও রসদ বহন অর্পিত হইয়াছে। ১৮৯১ সালে ভারতীয় নৌবিভাগের টর্পেডো প্রভৃতি রাজকীয় নৌবিভাগকে প্রদত্ত হয়। এই বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ভারত-সচিব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বোম্বাই ও কলিকাতায় ডক্ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রণতরীর ব্যয় যোগাইবার জন্য বৎসরে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাতের রাজকীয় তহবিলে পাঠাইয়া থাকেন। ঐ রণতরীর উপর ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; তবে ভারতবর্ষ হইতে দূরে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়।*

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," চতুর্থখণ্ড, ৩৮২-৩৮৩।

তৃতীয় অধ্যায়

উচ্চতর শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগ

ভারত সচিব—তাঁহার মন্ত্রী সভা—ভারতীয় কার্য্যালয়—গবর্ণর জেনারল—ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন কার্য্য—ইহার বিভাগ—ভারতের ব্যবস্থাপক সভা—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে ইহার গঠন প্রণালী—সভা ও সদস্যদিগের ব্যক্তিগত অধিকার—ব্রিটীশ শাসিত ভারতের বিভাগ—"প্রেসিডেন্সী" কথার অর্থ—স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ—গবর্ণরদিগের শাসন পরিষদ—প্রাদেশিক সচিব কার্য্যালয়—স্থানীয় (প্রাদেশিক) ব্যবস্থাপক সভা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গঠন প্রণালী—সভা ও সদস্যদিগের অধিকার।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের "ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতর শাসন সংক্রান্ত আইন" ("Act for the better Government of India") অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতশাসন কার্য্য ইংরাজ-রাজের হস্তে অর্পিত হয় এবং এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে, অতঃপর জনৈক ভারত সচিব, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার মন্ত্রীসভার সহিত পরামর্শ করিয়া, কোম্পানি ও শাসন সভার (Board of Control) সর্ব্ববিধ ক্ষমতার পরিচালনা করিবেন। ইংলণ্ডের অন্যান্য সচিবের ন্যায় ভারত সচিবও ইংলণ্ডেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভারত সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ বিষয়ে তিনিই রাজার বৈধ পরামর্শদাতা। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী সমাজের সদস্যরূপে ভারত সচিব, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকট ভারত শাসনের জন্য দায়ী; আবার এই মহাসভার প্রতিনিধিরূপে মহাসভার সর্ব্বময় প্রভুত্বের পরিচালক। এই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় ভারতের সর্ব্বময় প্রভু।

ভারত সচিবের মন্ত্রী সভা বা ভারতীয় মন্ত্রী সভায় (Council of India) প্রথমতঃ পঞ্চদশ জন সদস্য ছিলেন। ১৮৮৯ সালের বিধান অনুসারে এই সংখ্যা হ্রাস হইয়া দশজন হইয়াছে। সদস্যগণ ভারত সচিব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ব্যাবহারিক বা অন্য কোন বিশিষ্ট গুণ থাকিলে সদস্যদিগের মধ্যে ৩ জন আজীবন সদস্যরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন। অন্যান্য সদস্যগণ ১০ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন,—তবে অবস্থা বিশেষে এই সকল সদস্যের আরও ৫ বৎসরের জন্য পুনর্নিয়োগ হইতে পারে। মন্ত্রী সভার অন্ততঃ ৯ জন সদস্য এরূপ ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক যাঁহারা ব্রিটীশ শাসিত ভারতে অন্যূন ১০ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন কিংবা বাস করিয়াছেন অথচ সদস্য-পদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে ১০ বৎসরের অধিক দিন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

ভারত সচিবের মন্ত্রীসভার সংগঠন সম্বন্ধে গুরুতর পরিবর্ত্তন এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। নব গঠিত ইণ্ডিয়া কৌন্সিল বিলে (India Council Bill) বিধান আছে যে, মন্ত্রী সভার (Council) সদস্য সংখ্যা ৭ জনের ন্যূন ও ১০ জনের অধিক হইবে না। যদি বর্ত্তমান সদস্য দিগের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন তাঁহাদিগের নিয়োগ কালে ভারতবর্ষবাসী না হন, কিংবা যদি অন্ততঃ ৬ জন সদস্য তাঁহাদিগের নিয়োগকালে ভারতবর্ষ-বাসী, কিংবা অন্যূন ১০ বৎসরের সরকারী কর্ম্মচারী কিম্বা ভারতপ্রবাসী না হন (অথচ নিয়োগের ৫ বৎসর অনধিক পূর্ব্বে এরূপ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে), তাহা হইলে কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে তাহাতে ভারতবর্ষবাসী নিযুক্ত হইবেন। যিনি ভারতবর্ষবাসী, কিংবা যিনি ভারতের সরকারী কর্ম্মচারী বা ভারতপ্রবাসী, তিনিই এই পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলির বে-সরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নির্ব্বাচনযোগ্য

ব্যক্তিদিগের তালিকা হইতে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের বাৎসরিক বেতন ১২০০ পাউণ্ড (১৮০০০৲) ও ভাতা ৬০০ পাউণ্ড (৯০০০৲) হইবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে। এই বিলে ভারত সচিবকে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে, তিনি বিশেষ সর্ত্তে একজন রাজস্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভার সদস্য করিতে পারিবেন। এরূপ বিধানও আছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন আদেশে বা যুক্তরাজ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় কোন আদেশে ভারতসচিবের স্বাক্ষর না হইলেও চলিবে। বিবিধ বিধিনিষেধের মধ্যে কার্য্য করিবার নিয়মাবলী গঠন করিবার অধিকার ভারতসচিবকে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতসচিবের মন্ত্রী সভা তাঁহার সভাপতিত্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় যুক্তরাজ্যে সমাহিত সর্ব্ববিধ কার্য্য ও ভারতের সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভারতের রাজস্ব ব্যয় ও অন্যান্য কতকগুলি কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ বিধান আছে যে, মন্ত্রীসভার অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে ভারত-সচিবের আজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। তদ্ভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতসচিব ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীসভার মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। এরূপ স্থলে ভিন্ন-মতাবলম্বী সদস্যের মতামত ও তাঁহার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অধিকার সদস্যের আছে। এই মন্ত্রী সভা পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু কোন সদস্যেরই কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অধিকার নাই। ভারতসচিব কর্ত্তৃক উত্থাপিত না হইলে, যত প্রয়োজনীয় বিষয়ই হউক না কেন, কোন বিষয়েই মন্ত্রীসভা মতামত দিতে পারেন না। শান্তি, যুদ্ধ কিম্বা অপর রাজসম্বন্ধীয় বিষয়ে যেরূপ সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ যদি যুক্তরাজ্যের পরামর্শসভাকর্ত্তৃক মীমাংসিত বিষয়ে কোন ব্যয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভারতসচিব ব্যয়ের সম্বন্ধেও মন্ত্রী সভার পরামর্শ

উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার প্রাগুক্ত কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে কোন কোন পরিবর্ত্তন এখনও বিবেচনাধীন আছে।

ভারতসচিবের কার্য্যালয়কে ইণ্ডিয়া আপিস ("India Office") বলে। ইহা একপ্রকার তাঁহার সচিবদিগের কার্য্যালয়। ইহা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগ একজন স্থায়ী সচিবের অধীন। ইণ্ডিয়া আপিসের বিভিন্ন বিভাগানুযায়ী মন্ত্রীসভাও বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত।

ভারতবর্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা গবর্ণর জেনারল। তিনিই আবার রাজপ্রতিনিধি। তিনি ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্যকাল সাধারণতঃ ৫ বৎসর। শাসন পরিষদ্ (Executive Council) নামে তাঁহার এক মন্ত্রীসভা আছে। ইহাতে আপাততঃ ছয় জন সাধারণ সদস্য লওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ভারতের প্রধান সেনাপতিকে অসাধারণ সদস্যরূপে লওয়া যাইতে পারে এবং কার্য্যতঃ লওয়া হইয়া থাকে। কোন প্রেসিডেন্সিতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইলে সেই প্রেসিডেন্সির গবর্ণরকেও অসাধারণ সদস্যরূপে গণনা করা হয়।

গবর্ণর জেনারলের শাসন পরিষদের সদস্যগণকে ইংলণ্ডেশ্বর সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করেন। ইহার মধ্যে ৩ জন এমন ব্যক্তি হইবেন যাঁহারা নিয়োগকালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অন্ততঃ ১০ বৎসর রাজকার্য্য করিয়াছেন এবং একজন এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি যুক্তরাজ্যের ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অন্যূন ৫ বৎসর ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিয়াছেন।

শাসন পরিষদের সদস্যদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে সাধারণতঃ অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ হয় কিন্তু বিশিষ্ট স্থলে শাসন পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা গবর্ণর জেনারলের আছে। শাসন পরিষদের অধিবেশনে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ অর্থাৎ

ইহার কার্য্য বিবরণ সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য। এই সভা যাহা মীমাংসা করেন তাহা "মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের আজ্ঞা" নামে অভিহিত হয়।

ভারতের বড়লাটের শাসনতন্ত্রের দপ্তরখানার কার্য্য "মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের" নামে পরিচালিত হয়। ইহাই "ভারত গবর্ণমেণ্ট" নামে অভিহিত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন কার্য্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত—

(১) বৈদেশিক—বৈদেশিক রাজনীতি, সীমান্তের জাতি ও দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য এই বিভাগে নির্ব্বাহিত হয়।

(২) হোম ("Home") বা অভ্যন্তরীণ—ইহাতে সাধারণ শাসন কার্য্য পরিচালিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, আইন, বিচার, কারাগার, পুলিস এবং আরও কতকগুলি বিভাগের যাবতীয় কার্য্য এই বিভাগে সম্পাদিত হয়।

(৩) রাজস্ব ও কৃষি—ভূমির রাজস্ব, কৃষি সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও উন্নতি এবং দুর্ভিক্ষদমন সম্বন্ধীয় কার্য্যপরিচালন এই বিভাগের প্রধান কার্য্য।

(৪) আয়—এই বিভাগে ভারতীয় ও প্রাদেশিক আয়ের সাধারণ পরিচালন, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বেতন, ছুটি, পেন্সন এবং মুদ্রাবিনিময় ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

(৫) শিল্প বাণিজ্য—এতদ্দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ও ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রশ্নের তৎপরতার সহিত সমাধান করিবার জন্য এই বিভাগ ১৯০৫ সালে গঠিত হয়। নবগঠিত রেলওয়ে বোর্ড (Railway Board) এই বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু বোর্ডের উর্দ্ধতম সদস্য, রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রী সভার অতিরিক্ত সদস্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন এবং রাজপ্রতিনিধির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে।

(৬) ব্যবস্থাপক বিভাগ—গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রী সভায় ব্যবস্থা প্রণয়ন সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য এই বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৭) সাধারণ পূর্ত্ত।

(৮) সৈন্য।

(৯) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—এই বিভাগ পূর্ব্বে হোম বা অভ্যন্তরীণ বিভাগের অন্তর্গত ছিল কিন্তু ১৯১০ সাল হইতে ইহা পৃথক্ বিভাগে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য একজন সচিব ও দুইজন বিভিন্ন সম্পাদক আছেন।

স্বয়ং গবর্ণর জেনারল বৈদেশিক বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। সৈন্য বিভাগের ভার প্রধান সেনাপতির উপর। ছয়জন সাধারণ সদস্যের মধ্যে একজনের উপর (১) রাজস্ব ও কৃষি এবং (২) সাধারণ পূর্ত্ত বিভাগের ভার অর্পিত আছে। অপর পাঁচজন সদস্যের প্রত্যেকের উপর অবশিষ্ট পাঁচ বিভাগের এক একটির ভার ন্যস্ত আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এক এক জন সেক্রেটারী (সম্পাদক) প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। সামান্য প্রশ্ন প্রত্যেক বিভাগেই সমাহিত হয়। কোন বিষয়ে দুই বিভাগের মতভেদ হইলে বা কোন গুরুতর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে মন্ত্রী সভায় তাহার মীমাংসা হয়।

ব্যবস্থাপ্রণয়ন জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত অতিরিক্ত সদস্য মনোনয়ন করিয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। তখন এই সভার পূর্ণ আখ্যা "ব্যবস্থা ও বিধান প্রণয়ন জন্য মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল।" স্যার জন্ ষ্ট্রাচী বলেন, "অনেকে বলেন ব্যবস্থাপক সভার পৃথক অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আইনের চক্ষে একমাত্র মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব আছে।" যখন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিবার জন্য মন্ত্রী সভার অধিবেশন হয়, তখনই অতিরিক্ত সদস্যগণ যোগদান করিয়া থাকেন। মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল, মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত ভারত সচিবের

অনুমোদনে যে বিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন তদনুযায়ী গবর্ণর জেনারল এই অতিরিক্ত সদস্যগণকে মনোনয়ন করিতেন। ১৮৯২ সালে গঠিত পার্লিয়ামেণ্টের ব্যবস্থা অনুসারে ইহাদিগের সংখ্যা ১০ জনের ন্যূন ও ১৬ জনের অধিক হইত না। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে গঠিত নিয়মে ১৬ জন অতিরিক্ত সদস্য থাকিতেন। তন্মধ্যে ৬ জন মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী থাকিতেন ও অবশিষ্ট ১০ জন সদস্য বে-সরকারী হইতেন। উক্ত ১০ জন বে-সরকারী সদস্যের মধ্যে ৪ জন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী অতিরিক্ত সদস্যগণকর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া গবর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। পঞ্চম বে-সরকারী সদস্য কলিকাতার বণিক্ সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। প্রয়োজন হইলে গবর্ণর জেনারল কোন মনোনয়ন নামঞ্জুর করিতে পারিতেন। তখন পুনর্ব্বার মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত। অবশিষ্ট ৫ জন সদস্য গবর্ণর জেনারলের ইচ্ছামত মনোনীত হইতেন। অতিরিক্ত সদস্যদিগের কার্য্যকাল দুই বৎসর ছিল।

১৯০৯ সালের বিধান অনুসারে গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার গঠন নীতি এইরূপ ছিল—

৯ জন পদাধিকারী (Ex-officio) সদস্য (যথা মাননীয় রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ সভাপতি, গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রী সভার সাধারণ সদস্য এবং যে প্রদেশে মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইবে তথাকার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর); ২৮ জন মনোনীত সরকারী সদস্য, ইহার মধ্যে ৮ জন বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিতেন (যথা মান্দ্রাজ ১, বোম্বাই ১, বঙ্গদেশ ১, যুক্তপ্রদেশ ১, পঞ্জাব ১, পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম ১, ব্রহ্মদেশ ১ ও মধ্য প্রদেশ ১); ৭ জন মনোনীত বে-সরকারী সদস্য, ইহার ৩ জন যথাক্রমে পঞ্জাবের

জমীদার, পঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় ও ভারতের বণিক্‌দিগের প্রতিনিধি; ২৫ জন নির্ব্বাচিত বে-সরকারী সদস্য; একুনে ৬৯ জন সদস্য।

এই বিধানে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, প্রতি ২য়, ৪র্থ (অর্থাৎ এক নির্ব্বাচন বাদে অন্য নির্ব্বাচনে) প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে নির্ব্বাচনে দুইজন অতিরিক্ত সদস্য, যুক্তপ্রদেশের এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। সেবার মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ৩৫ জনের স্থানে ৩৩ জন হইত।

সম্প্রতি যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ফলে, গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রী-সভার গঠন প্রণালী নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে—

৯ জন পদাধিকারী সদস্য, ২৮ জন মনোনীত সরকারী সদস্য, ইহার মধ্যে ৯ জন বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি (যথা মান্দ্রাজ ১, বোম্বাই ১, বঙ্গদেশ ১, যুক্তপ্রদেশ ১, পঞ্জাব ১, ব্রহ্মদেশ ১, বিহার ও উড়িষ্যা ১, মধ্যপ্রদেশ ১, ও আসাম ১), এবং ৫ জন মনোনীত বে-সরকারী সদস্য।

২৭ জন নির্ব্বাচিত সদস্য, তন্মধ্যে—

(১) ১২ জন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক, (২) ৬ জন, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা, এবং মধ্য প্রদেশের জমীদারবৃন্দকর্ত্তৃক, (৩) ৫ জন, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার উড়িষ্যার মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক (৪) ১ জন পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গদেশের মুসলমান সম্প্রদায় ও যুক্তপ্রদেশের মুসলমান জমীদার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক (৫) ২ জন, কলিকাতা ও বোম্বাইএর বণিক্ সম্প্রদায়কর্ত্তৃক (৬) এবং ১ জন মধ্য প্রদেশের মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক আইনে গবর্ণর জেনারলের সম্মতি আবশ্যক। ইংলণ্ডেশ্বর কোন আইন ইচ্ছা করিলে রদ করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোন আইনে তাঁহার অনুমোদনের প্রয়োজন নাই।

১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়া কৌন্সিল আইন অনুসারে গুরুতর প্রয়োজন হইলে, মন্ত্রণাসভায় না জানাইয়া গবর্ণর জেনারল স্বয়ং এরূপ বিধান করিতে পারেন যাহা ছয় মাস কাল আইনের ন্যায় বলবৎ থাকিবে।

পার্লিয়ামেণ্টের যে সকল বিধানে ভারতগবর্ণমেণ্ট গঠিত তাহা কোন রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং এরূপ কোন বিধান গঠিত হইতে পারে না যাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের অধিকার বা রাজার প্রতি বশ্যতার কোনরূপ হ্রাস হয়। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গর্বর্ণর জেনারলের, সমস্ত ব্রিটীশ শাসিত ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়নের অবাধ ক্ষমতা আছে।

ব্রিটীশ ভারত অর্থাৎ মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের অধীন ভূভাগ পূর্ব্বে ৮টি বৃহৎ প্রদেশ ও ৫টি ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহাদের প্রত্যেক অংশকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বলে। ৮টি বৃহৎ প্রদেশের নাম মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী; ৫টি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসিত প্রদেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ আসাম, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ; এবং চিফ্ কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত মধ্য প্রদেশ। ক্ষুদ্র বিভাগগুলির নাম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ব্রিটীশ বেলুচিস্থান, কুর্গ, আজমীর-মাড়োয়ার এবং দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদিগের উপনিবেশ স্থান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশই মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ নামে পরিচিত। সিন্ধুদেশ বিজিত হইবার পরে ইহা ১৮৪৩ সালে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে "প্রেসিডেন্সী" কথাটির কোন সার্থকতা নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথমাবস্থায় বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন প্রধান উপনিবেশের কার্য্য প্রত্যেক স্থলেই কোম্পানির কর্ম্মচারী লইয়া একটি মন্ত্রীসভা ও প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। এই প্রেসিডেণ্টের অধিকার যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই সমস্ত প্রদেশকে প্রেসিডেন্সী

বলিত। "বাঙ্গলার ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্সী" বলিলে কেবল বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যাই বুঝাইত না, পরন্তু উত্তর ভারতে ব্রিটীশশাসিত সমস্ত প্রদেশই ইহার অন্তর্গত ছিল অর্থাৎ কলিকাতার প্রধান কার্য্যস্থল ফোর্ট্ উইলিয়ম হইতে শাসিত সমগ্র প্রদেশ ইহার অন্তর্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইত। যথার্থ বলিতে গেলে বঙ্গদেশ একটা প্রেসিডেন্সী ছিল না, পরন্তু ইহা ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর বঙ্গপ্রদেশকেই বুঝাইত।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে ঘোষণা হইয়া যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে তদনুযায়ী নিম্ন লিখিতরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—

১। পুরাতন বাঙ্গালা দেশের বঙ্গভাষী পাঁচটি বিভাগকে একত্র করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরের শাসনাধীন একটি প্রেসিডেন্সীতে পরিণত করা হইয়াছে। এই প্রদেশের রাজধানী কলিকাতায় অবস্থিত, কিন্তু ইহাও ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ঢাকা দ্বিতীয় রাজধানীরূপে গণ্য হইবে। যেরূপ যুক্তপ্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মধ্যে মধ্যে লক্ষ্ণৌ নগরে বাস করেন, সেইরূপ বাঙ্গলার গবর্ণর ঢাকায় অবস্থান করিবেন।

২। বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জনৈক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনে পৃথক প্রদেশরূপে গণ্য হইয়াছে। এ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা আছে ও ইহার রাজধানী পাটনা।

৩। আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় একজন চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন হইয়াছে।

ভারতশাসন সম্বন্ধীয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে প্রধানতঃ শাসনের এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পরন্তু ভারতে ও ইংলণ্ডে কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা প্রণয়নেরও প্রয়োজন হইয়াছিল।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতসচিব যথাবিহিত ঘোষণা করেন যে, ভারতের গবর্ণর জেনারল অতঃপর বাঙ্গলার ফোর্ট্ উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর

থাকিবেন না। বঙ্গ প্রদেশের জন্য একজন পৃথক্ গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন।

১৯১২ সালের ২১ শে মার্চ্চ তারিখের রাজকীয় আদেশে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর্ব্বজনপ্রিয় লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯১২ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী বাঙ্গলার পূর্ব্বতন লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্ণরের শাসিত প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে।

ভবিষ্যতে যে সকল স্থান বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, ঐ তারিখের আর একটি ঘোষণা দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যে সকল স্থান ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে আসামের চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন ছিল, ঐ তারিখের তৃতীয় ঘোষণা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎভাবে মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া পুনরায় আসামের চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন হইয়াছে।

সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (শাসন কর্ত্তৃপক্ষ) সমভাবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের কর্ত্তৃত্বাধীন ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞাপালন করিবেন এবং তাঁহার নিকট স্বীয় স্বীয় কার্য্য বিবরণ জ্ঞাপন করিবেন। স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান ব্যক্তি (অর্থাৎ গবর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও চীফ্ কমিশনার) নিজ নিজ প্রদেশে প্রধান শাসনকর্ত্তা।

বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রত্যেকটি ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত জনৈক গবর্ণর ও শাসন পরিষদের শাসনাধীন। প্রধানতঃ ইংলণ্ডের রাজনীতিবেত্তারাই গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন এইরূপ দুই ব্যক্তি ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত জনৈক

ভারতীয় ভদ্রলোক বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া থাকেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গবর্ণরদিগের, ভারতসচিবের সহিত সাক্ষাৎভাবে পত্র ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। তাঁহারা গবর্ণর জেনারলের ন্যায় গুরুতর প্রয়োজনে সদস্যদিগের মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

নব গঠিত বিহার উড়িষ্যা প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনপরিষদ্ নাই। এই পরিষদের সদস্যগণ ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদনে গবর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে স্থলে শাসন পরিষদ্ আছে, সেখানে দুইজন সদস্য ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আর তৃতীয় ব্যক্তি ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহাদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর। শাসনপরিষদ্ না থাকিলে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর একাকীই শাসনকর্ত্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় থাকেন। প্রধান গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিলেই বিহার উড়িষ্যা ব্যতীত অন্য প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগেরও শাসনপরিষদ্ হইবে।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীদিগের কার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া সেক্রেটারী ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী আছেন। রাজস্ব ও শাসন সম্বন্ধীয় সাধারণ বিভাগ ব্যতীত কার্য্যের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি বৃহৎ প্রদেশে প্রায়ই একরূপ। বাঙ্গলায়, পুলিস, জেল ও রেজিষ্ট্রেশনের ইন্স্পেক্টার জেনারল, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার, সিভিল হাঁসপাতালের ইন্স্পেক্টার জেনারল, স্যানিটারী কমিসনার (স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা) এবং সিভিল ভেটারিনারি (পশু চিকিৎসা) বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। এতদ্ভিন্ন জলসেচন, নৌ-বিভাগ, এবং অট্টালিকা ও রাজপথের জন্য প্রধান এঞ্জিনিয়ার আছেন। ইহারা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীস্বরূপ।

ব্যবস্থাপ্রণয়ন জন্য গবর্ণর ও তাঁহার শাসনপরিষদের সহিত অতিরিক্ত সদস্য মিলিত হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। পূর্ব্বে অতিরিক্ত সদস্য ৮ জনের ন্যূন ও ২০ জনের অধিক হইত না। প্রাদেশিক এড্‌ভোকেট জেনারল একজন সদস্য হইতেন এবং মোট সদস্য সংখ্যার অর্দ্ধেক বে-সরকারী ব্যক্তি হইতেন। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের গঠিত নিয়মানুযায়ী গবর্ণরকর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ভারত-সচিবের অনুমোদনে ইহারা নিযুক্ত হইতেন। ১৮৯২ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত নিয়মে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই উভয় স্থানেই এই সদস্য সংখ্যা ২০ জন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার মধ্যে সরকারী সদস্য সংখ্যা ৯ জনের অধিক হইতে পারিবে না। এই নিয়মে মনোনীত সদস্যগণ সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইবেন, এই উদ্দেশ্যে নিয়মগুলি প্রণীত হইয়াছে। উল্লিখিত বহুকালব্যাপী পরিবর্ত্তনে প্রেসিডেন্সীদ্বয়ে আরও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন ৪টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এবং কতিপয় রাজবিধি ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের গঠিত নিয়ম অনুযায়ী মনোনীত (এবং সপারিষদ ভারতসচিব কর্ত্তৃক অনুমোদিত) সদস্য থাকেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সদস্য মনোনয়নের নিয়মগুলির ন্যায় এই প্রদেশের নিয়মগুলিও এক সাধারণ নীতির (অর্থাৎ সদস্যগণ যাহাতে সাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারেন) উপর স্থাপিত।

পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের ব্যবস্থাপক সভার ২০জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। ইহার মধ্যে ১০ জনের অধিক সরকারী সদস্য থাকিতেন না। অবশিষ্ট ৭ জন সদস্যের নিম্নলিখিত-রূপে নির্ব্বাচন হইত—বাঙ্গলা দেশের গ্রাম ও নগরের মিউনিসিপালটিগুলি

২ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিতেন, জিলা বোর্ডগুলি ২ জন এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটি, বণিক্ সভা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকে একজন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচন করিতেন। বিভাগীয় কমিশনারদিগের অধিকারের ন্যায়, প্রদেশের সমস্ত মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ড আট বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল। এক একবারে প্রত্যেক প্রকারের দুই শ্রেণী করিয়া ৪ শ্রেণীতে ১ জন করিয়া প্রত্যেক নির্ব্বাচনে অধিকার পাইত। ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ সদস্যের কার্য্যকাল দুই বৎসর ছিল সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণী ৮ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচন অধিকার পাইত।

নূতন বিধান অনুসারে ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায় একজন মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। আসাম ও বিহার প্রদেশ বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চা-কর ও নীলকরগণের প্রেরিত প্রতিনিধি সংখ্যা ১ জনে দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলার চা বাগানের ম্যানেজারগণ এই সদস্যকে মনোনীত করিবেন। পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জের বণিক্ সভা পাটের বণিক্‌গণের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্য স্থানের য়ুরোপীয় বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। *

প্রত্যেক নির্ব্বাচনকারী বিভাগে অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের মিউনিসিপালিটি সমূহ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সমূহ, মুসলমান সম্প্রদায় এবং জমীদার সম্প্রদায় ১ জন করিয়া সদস্য প্রেরণ করিবেন। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপ্যাল স্বার্থ গুরুতর বলিয়া এই দুই বিভাগ পর্য্যায়ক্রমে একজন অতিরিক্ত সদস্য প্রেরণ করিবেন। চট্টগ্রাম বিভাগের মিউনিসিপাল ও জমীদারী স্বার্থের গুরুত্ব কম বলিয়া এই

---

* পঞ্চম "দশম বার্ষিক নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি" ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও জমীদার সম্প্রদায় পর্য্যায়ক্রমে ১ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন।

উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটি যে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন তদ্ভিন্ন কলিকাতা নগর ১ জন প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইয়াছে।

পুরাতন ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৬ ছিল, এক্ষণে ২৮ হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৭ জনের অনধিক সরকারী সদস্য হইতেন; এখন সেই সংখ্যা ১৬ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণর দুইজন বে-সরকারী সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে ৪৮ জন নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্য ব্যতীত দুই জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মনোনীত হইতে পারিবেন।*

গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রিসভায় যেরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে কতকগুলি সর্ত্ত আছে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণর বা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সেইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা প্রাদেশিক বজেটের তর্ক বিতর্ক সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিবার অধিকার আছে। পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বজেট সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

"ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গবর্ণর জেনারল আর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর থাকিলেন না। নব গঠিত বঙ্গদেশ একজন পৃথক গবর্ণরের অধীনে প্রেসিডেন্সী শাসনবিভাগে পরিণত হইল। ভারত গবর্ণমেন্টের ১৯১২ সালের

---

* ইলবার্টের "করোনেশন দরবার ও তাহার ফলাফল" নামক পুস্তক দেখ।

আইন অনুসারে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গবর্ণর ও মন্ত্রিসভার ন্যায় বাঙ্গলার গবর্ণর ও মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ একইপ্রকার বিধানের অধীন এবং উক্ত প্রদেশদ্বয়ের সমকক্ষ। উক্ত আইন অনুসারে নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে শাসনপরিষদ্ সম্বন্ধীয় ১৯০৯ সালের বিধান প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে বাঙ্গলায় যেরূপ ১৯১০ সালে শাসনপরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছে সেইরূপে গঠিত শাসনপরিষদ্ ১৯১২ সালের ১লা আগষ্ট হইতে বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা ৩।" *

---

* "ভারতবর্ষের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি" বিষয়ক পঞ্চম রিপোর্টের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

অধস্তন শাসন বিভাগ

শাসন সংক্রান্ত দেশ বিভাগ—ব্যবস্থানিয়ন্ত্রিত প্রদেশ সকল—বড়লাটের আদেশ ক্রমে পরিচালিত বা বে-বন্দোবস্ত প্রদেশ সমূহ—জেলা—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর—প্রাদেশিক পুলিস—সামরিক পুলিস—গ্রাম্য পুলিস—রেলওয়ে পুলিস—গোয়েন্দা বিভাগ—স্বায়ত্তশাসন—মিউনিসিপালিটী—ইহাদের গঠন, কার্য্য ও আয়ের উপায়—কলিকাতা কর্পোরেসন্—জেলা বোর্ড—মহকুমার বোর্ড—ইহাদের গঠন, কার্য্য ও আয়ের উপায়।

ভারতগবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল গবর্ণমেণ্টসংশ্লিষ্ট আইন-প্রণয়নকারী সভাসমূহের বৃত্তান্তও ঐ সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই সকলের অধস্তন বিভাগগুলি বর্ণনা করা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথমে শাসন-সংক্রান্ত দেশ বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট প্রণীত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও উক্ত বড়লাটের আদেশক্রমে পরিচালিত বা বে-বন্দোবস্ত প্রদেশ সমূহে বিভক্ত আছে। প্রথমোক্তগুলি চার্টার বিধির নিয়মানুযায়ী শাসিত হইত। শেষোক্তগুলি উক্ত বিধি বহির্ভূত আইন দ্বারা সপারিষদ-গবর্ণর জেনেরালের আদেশানুযায়ী শাসিত হইত। উভয়ের মধ্যে আইন এবং শাসন শক্তির গঠনপ্রণালী ও উপাদানে বিভিন্নতা ছিল। অধুনা ঐ বিভিন্নতা তিরোহিত হইলেও কর্ম্মচারীদিগের নামে (যাহার দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে) এবং শাসনসংক্রান্ত পদের দক্ষতা সম্বন্ধে এই বিভিন্নতা অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। নিয়মাবলী অনুসারে যে সকল

পদ উচ্চাঙ্গের রাজকীয় বেসামরিক কর্ম্মচারীদিগের জন্য রক্ষিত সে গুলি শেষোক্ত বিভাগ সমূহে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। মান্দ্রাজ, সিন্ধু বর্জ্জিত বোম্বাই, বঙ্গদেশ এবং আগ্রা ইহাই পুরাতন ব্যবস্থানিয়ন্ত্রিত প্রদেশ এবং পঞ্জাব, ব্রহ্ম, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম প্রধান বেবন্দোবস্ত প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। অধুনা অযোধ্যা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে এবং আসাম (যাহা কিছুকালের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের সহিত একই শাসনের অন্তর্গত হইয়াছিল) এক্ষণে স্বীয় ব্যবস্থাপক-সভাসহ স্বতন্ত্র চীফ্ কমিশনারের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং, এই দুইটী প্রদেশ বর্ত্তমানে আর বে-বন্দোবস্ত প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

একটী প্রদেশ কতকগুলি জেলার সমষ্টি রূপে বিবেচিত হয় এবং এই জেলাগুলি আবার মহকুমা ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত। ব্রিটীশ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক একক হইতেছে জেলা; একজন কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কমিশনার এই জেলা শাসন করেন। ব্রিটীশ ভারতে এই প্রকার ২৬৭টী জেলা আছে। মোটের উপর প্রত্যেক জেলায় ৪০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান এবং গড়ে ৯০০, ০০০ অধিবাসী আছে। প্রকৃত পক্ষে, প্রত্যেক জেলার আকার ও লোক সংখ্যায় যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় * ৪॥০ সাড়ে চারি কোটী অধিবাসী ও ৬৩৪৭ বর্গ মাইল স্থান আছে। †

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ জেলার পুলিসের কর্ত্তা। শাসন সম্বন্ধে পুলিসকে একটী প্রধান বিভাগ গণ্য করা যাইতে পারে। পুলিস ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শাসিত হয়। তবে, সাধারণতঃ ইহা ১৮৬১ সালের

---

* সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে এই জেলা তিনটী স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হইবে।

† পঞ্চম "দশম বার্ষিক নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি বিষয়ক রিপোর্ট," ৬২ পৃষ্ঠা।

আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে ইহার কার্য্যাবলী নিষ্পন্ন হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত একটী কমিশন পুলিস সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ কমিশনের মন্তব্যানুযায়ী কতকগুলি আদেশও প্রচারিত করিয়াছেন, কিন্তু নূতন নিয়ম সংবলিত কোন আইন এ পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ হয় নাই।

প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন যে পুলিস থাকে, তাহা একটি মাত্র সঙ্ঘ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাদেশিক পুলিস সাধারণতঃ একজন ইন্সপেক্টর জেনেরালের অধীন। প্রতি জেলার পুলিস-শাসন বিভাগ ডিষ্ট্রিক্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নামধেয় জনৈক কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হয়। তিনি নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের জন্য দায়ী এবং তিনি শান্তি রক্ষা এবং অপরাধী ধৃতকরণ ও দমন সংক্রান্ত সকল বিষয়ের জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন। স্থবিধার জন্য, প্রত্যেক জেলা কয়েক জন ইন্সপেক্টরের অধীন করিয়া বিভক্ত করা হয়। অধিকাংশ প্রদেশেই ফাঁড়ি নামক কতকগুলি অধস্তন পুলিসের আড্ডা আছে। প্রত্যেক জেলার সদরে একজন ইন্সপেক্টরের অধীনে আকস্মিক ব্যবহার জন্য অতিরিক্ত পুলিস থাকে। জেলার কোন স্থানে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, শেষোক্ত পুলিস, সাধারণ পুলিসকে সাহায্য করে।

বঙ্গদেশ, আসাম, ব্রহ্ম এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অশান্তিকর স্থানে সামরিক পুলিস রক্ষিত হয়।

প্রত্যেক থানা বা পুলিস ষ্টেশনের অধীনে কতকগুলি করিয়া গ্রাম থাকে এবং প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন করিয়া চৌকিদার বা রক্ষক আছে। চৌকিদারের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে অপরাধের সংবাদ প্রেরণ

করা, কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য কর্ত্তব্যও আছে। সহরে থানা, ফাঁড়ি এবং চৌকিদারের পাহারার সীমানার ও নিশাকালে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত আছে।

রেলওয়ে পুলিসের ব্যবস্থা জেলা পুলিস হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু উভয়ে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করে। সাধারণতঃ, রেলওয়ে পুলিস রেলওয়েতে শান্তি ও আইন রক্ষার্থে ব্যাপৃত থাকে; রেলওয়ে সম্পত্তি রক্ষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; এই সকল সম্পত্তি রক্ষা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণই করিয়া থাকেন।

বহুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ঠগী ও ডাকাতি বিভাগ ১৯০৪ সালে লুপ্ত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের "হোম" বা আভ্যন্তরীণ বিভাগের অধীনে "কেন্দ্রীয় অপরাধি অনুসন্ধান বিভাগ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিভাগ রেলওয়ে বিভাগ সংক্রান্ত অপরাধ ও অপরাধ-প্রবণ জাতি, যাযাবর জাতি, দলবদ্ধ ডাকাত এবং যে সকল অপরাধী একাধিক প্রদেশে অপরাধানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের সম্বন্ধেই বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও জ্ঞাপন করে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বর্ত্তমানে শাসন বিভাগের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহা স্বল্প দিন মাত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল অনুষ্ঠানের অভ্যন্তর দিয়া ইহা কার্য্য করে, তাহাদিগকে মুখ্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ মিউনিসিপালিটী এবং বিভিন্ন প্রকারের বোর্ড। স্থানীয় বিধিসমূহ দ্বারা ইহাদের গঠন স্থিরীকৃত হয় এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একই প্রথা প্রচলিত নহে।

প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ১৮৭২, ১৮৭৬ ও ১৮৭৮ সালে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজের করদাতাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা প্রতিষ্ঠিত

হয়। ১৮৮১-৮২ সালে লর্ড রিপণের গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী স্বায়ত্ত-শাসনের মূলতত্ত্ব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। নগর ও প্রাদেশীয় অধিবাসিবৃন্দ স্থানীয় ব্যাপারে যেরূপ অধিকার ভোগ করিত, এই সময় হইতে তাহারা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকৃত আবশ্যকীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে লাগিল। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপার আরও প্রশস্ততর হইল এবং অনেক নগরের কমিটীতে বে-সরকারী ব্যক্তিকে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদানে অধিকতর স্বাধীনতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হইল। ইতঃপূর্ব্বে এই নগরবাসীরা স্থানীয় রাজপুরুষদিগকে এই সকল পদে নির্ব্বাচিত করিত।

মিউনিসিপাল কমিশনার-ভুক্ত কমিটীতেই মিউনিসিপাল শাসনভার ন্যস্ত থাকে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এই সকল মিউনিসিপাল কমিশনারকে মিউনিসিপাল কাউন্সিলর বলে। অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীতেই কতক-গুলি কমিশনর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন; আর কতকগুলি কমিশনার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নামানুসারে বা তাঁহাদের পদানুসারে মনোনীত হইয়া থাকেন। কখনও কখনও মিউনিসিপালিটীর সভাপতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। তবে অনেক সময় কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য হইতেই সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। জেলার কালেক্টর ও বিভাগীয় কমিশনার ইহাদিগের কার্য্যাবলী সংযত রাখেন। কমিশনারগণ অবহেলা করিলে গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং অযোগ্যতা, ত্রুটী বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য তাঁহাদিগকে অস্থায়ী ভাবে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন।

মিউনিসিপালিটীর কার্য্যাবলী, সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা বিধান, স্বাস্থ্য, সুবিধা ও শিক্ষা এই কয় ভাগে বিভক্ত। এই সকলের অন্তর্ভুক্ত কর্ত্তব্য যথেষ্ট ও নানা প্রকারের। কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মিউনিসিপাল

আইন ও উপবিধি দ্বারা মিউনিসিপালিটীকে নানারূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। চুঙ্গি বা নগরে আনীত দ্রব্যের উপরে শুল্ক; গৃহ, ভূমি, যান বাহন, জন্তু ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কর; রাজপথ ও খেয়াঘাটের শুল্ক, জল, আলো ও মলমূত্রাদি পরিষ্কার জন্য কর—এই গুলিই প্রধান কর।

কলিকাতা কর্পোরেশনে কমিশনারগণের সংখ্যা ৫০। তন্মধ্যে প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচিত ২৫ জন ব্যতীত নিম্নোক্ত প্রকারে ২৫জন মনোনীত হইয়া থাকেন:—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৫ জন, বঙ্গদেশীয় বণিক্ সভা (Bengal Chamber of Commerce) ৪ জন, কলিকাতা ব্যবসায়ী সমিতি (Trades' Association) ৪ জন, কলিকাতা বন্দরের কমিশনারগণ ২ জন। কর্পোরেশনের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার তিনটী তুল্য ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষের—যথা কর্পোরেশন, তাহার সভাপতি, এবং দ্বাদশ জন কমিশনর সংগঠিত কমিটীর হস্তে ন্যস্ত আছে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই কর্পোরেশনের শাসন বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী এবং তিনিই ইহার সভার সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটী প্রেসিডেন্সী নগরে অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত ও শাসন বিষয়ক অধিকারের কতকাংশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যে বিধি দ্বারা নির্ব্বাচন প্রথা আরও বর্দ্ধিত হইবে, তাহা বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং বঙ্গদেশীয় কাউন্সিল দ্বারাও শীঘ্র এই সম্বন্ধীয় বিধি বিধিবদ্ধ হইবার আশা করা যাইতেছে। ইহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, নূতন কর্পোরেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি থাকিবেন, কমিশনরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সভাপতির পরিবর্ত্তে তিনি কমিশনারগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৮৮১-৮২ সালে লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক প্রচারিত আদেশানুযায়ী স্থানীয় কার্য্যাবলী সম্পাদনের জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লোকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে মান্দ্রাজে তিন শ্রেণীর বোর্ড আছে। এই প্রদেশের অধিকাংশ স্থলে বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম গুলি অথবা গ্রাম সমষ্টি "পল্লীসমিতি" (Union) রূপে গঠিত হইয়াছে এবং এই সকল সমিতির শাসনকারী সভাকে বহুকাল হইতে প্রবর্ত্তিত "পঞ্চায়েত" নাম প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল সমিতি সাধারণতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ গৃহাদির উপরে সামান্য সামান্য কর আদায় করে। ইহার পরেই "তালুক সমিতি"কে উল্লেখ করা যাইতে পারে; এগুলি শাসন সম্বন্ধীয় স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পাদন করে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে জেলা-বোর্ডগুলি; ইহারা প্রত্যেক জেলা সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পরিদর্শন করে। বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে আইনানুসারে প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু অধস্তন লোকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে হইতে পারে। বঙ্গদেশের ৩৪টী জেলায় জেলাবোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় আইনে পল্লী সমিতি স্থাপন অনুমোদন করে, কিন্তু ইহা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাচন প্রথা বিভিন্ন রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় যে জেলাসমূহে মহকুমা বা লোক্যাল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তথায় এই শেষোক্ত বোর্ড সমূহ জেলা বোর্ডের সদস্যগণের অন্যূন অর্দ্ধাংশ নির্ব্বাচিত করিবার ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারে। উন্নত জেলাসমূহে মহকুমা বা লোক্যাল বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন; অন্যান্য জেলায় সকল সদস্যগণই মনোনীত হইয়া থাকেন। জেলাবোর্ডের সভাপতি মনোনীত কি নির্ব্বাচিত হইবেন তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন। কোন প্রদেশেই নির্ব্বাচন অনুমোদিত হয় নাই

এবং সাধারণতঃ এক্ষণে সর্ব্বত্রই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই সভাপতি হইয়া থাকেন।

বোর্ড গুলির প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে স্থানীয় রাস্তা পথ ঠিক রাখা ও উহাদের উন্নতি সাধন করা। দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় স্থাপন, জল নিষ্কাশন ও জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, শিক্ষার (বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার) প্রতি দৃষ্টি, হাট নির্ম্মাণ ও তাহার সুবন্দোবস্ত এবং দুর্ভিক্ষের সময় লোকের সাহায্য—এই গুলিই বোর্ডের অন্যান্য প্রধান কর্ত্তব্য।

বোর্ডগুলির প্রধান আয় হইতেছে প্রাদেশিক কর। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত দান, খোঁয়াড় ও খেয়া ঘাটের আদায় এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রাপ্ত অর্থ হইতেই বোর্ড অনেক আয় করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম্মাধিকরণ

হাইকোর্ট—ইহার ক্ষমতা—কে হাইকোর্টের জজ হইতে পারেন—চীফকোর্ট—অধস্তন বিচারালয়—ইহাদের পদ মর্য্যাদা—শাস্তি দিবার ক্ষমতার পরিমাণ—জুরী এবং এসেসর—দয়া প্রকাশের বিশেষ অধিকার—প্রিভিকাউন্সিলের বিচার বিভাগ।

হাইকোর্ট ও চীফকোর্ট গুলিই ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়। ১৮৬১ সালে বিধিবদ্ধ ভারতীয় হাইকোর্ট বিধি (Indian High Courts' Act) নামক পার্লিয়ামেণ্টের আইনানুযায়ী সম্রাট্ বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিধিতে স্থিরীকৃত হয় যে, সম্রাট্ই বিচারকগণ নিযুক্ত করিবেন এবং ইঁহারা সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী পদভোগ করিবেন। হাইকোর্টের বিচারকের ইংলণ্ড বা আয়র্লণ্ডের বারিষ্টার অথবা স্কটলণ্ডের এডভোকেট হওয়া এবং অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল ব্যারিষ্টারী করিয়াছেন এরূপ গুণ থাকা আবশ্যক; ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস অন্তর্ভুক্ত কোন কর্ম্মচারী দশ বৎসর এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে এবং অন্ততঃ তিন বৎসর জেলা জজের কার্য্য করিয়া থাকিলে, তিনিও হাইকোর্টের জজ হইতে পারেন। সবজজ অথবা কোন ব্যক্তি ছোট আদালতের জজিয়তী পদে পাঁচ বৎসর নিযুক্ত থাকিলে তিনিও এই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন; কেহ হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতী কর্ম্মে ব্রতী থাকিলে তিনিও হাইকোর্টের জজিয়তী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন। হাইকোর্টে একজন প্রধান জজ এবং সম্রাটের বিবেচনানুযায়ী পঞ্চদশ জন জজের অনধিক জজ থাকিবেন। প্রধান

বিচারক ও অন্যান্য বিচারকগণের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ ব্যারিষ্টার বা এড্‌ভোকেট হওয়া আবশ্যক এবং অন্ততঃ অন্য একতৃতীয়াংশ ভারতবর্ষের সিভিল-সার্ব্বিস ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। হাইকোর্টই সকল অধস্তন আদালতের কার্য্য পরিদর্শন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। তবে, শেষোক্ত কার্য্য সপারিষদ-গবর্ণর-জেনেরালের অনুমতি সাপেক্ষ।

এই সকল নিয়মাবলী. ১৮৬২ সালের আদেশ পত্রে প্রচারিত ও ১৮৬৫ সালে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয় এবং তদনুযায়ী বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ সালে প্রচারিত আদেশ পত্রানুযায়ী এলাহাবাদেও একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি পাটনাতেও হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের বঙ্গদেশ ও আসামের উপর অধিকার রহিয়াছে। ইহার দেওয়ানী মামলা বিচারের অধিকার নিম্নোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) কলিকাতা প্রেসিডেন্সী সহরের মধ্যে স্মলকজকোর্টের মোকদ্দমা ব্যতীত, অন্যান্য যে সকল মামলা সাধারণতঃ হাইকোর্টে সাধারণ আদিম বিভাগে দায়ের হইতে পারে তাহাদের বিচার।

(২) আদিম বিভাগের অসাধারণ ক্ষমতা—যদ্দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে যে কোন মোকদ্দমা অধস্তন আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া বিচার।

(৩) জেলা-জজ ও কোন কোন ক্ষেত্রে সবজজদিগের মোকদ্দমার আপীল শ্রবণ।

(৪) নাবালক, জড়বুদ্ধি ও বাতুলসম্বন্ধীয় ও তাহাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে বিচার ক্ষমতা।

(৫) দেউলিয়াগণকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।

(৬) রণপোত ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও উইলের বলে বা তদভাবে সম্পত্তি-লাভবিষয়ক মামলার অধিকার।

(৭) গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের বিবাহসম্বন্ধীয় বিচারাধিকার।

কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের অধিকার নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে :—

(১) প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তৃক দায়রায় সোপরদ্দ করা মোকদ্দমার বিচারের অধিকার। এক্ষেত্রে সর্ব্বদাই জুরীগণের সাহায্যে বিচার করা হয়।

(২) প্রেসিডেন্সী সহরের বহির্ভাগে যে সকল মামলা কোন বিশেষ কারণে নিম্ন আদালতে দায়ের না হইয়া হাইকোর্টে গৃহীত হয়, সেই সকলের বিচারের অধিকার।

(৩) আপীল, মীমাংসা বা পুনর্বিচারের অধিকার।

কলিকাতা হাইকোর্টেরই ন্যায় বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ক্ষমতা। ইউরোপীয় ব্রিটীশ প্রজার বিরুদ্ধে যে সকল ফৌজদারী মামলা ঘটে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সাধারণ আদিম বিভাগে বিচারের অধিকার নাই।

পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে দুইটী চীফকোর্ট আছে। প্রথমোক্তটী ১৮৬৬ সালে লাহোরে ও শেষোক্তটী ১৯০০ সালে রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারাও হাইকোর্টের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে ইহারা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা হইতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক চীফকোর্টে সপারিষদ গবর্ণরজেনেরাল কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারক ও অন্যান্য বিচারক আছেন। অন্যান্য প্রদেশে হাইকোর্ট বা চীফকোর্টের পরিবর্ত্তে জুডিসিয়াল কমিশনার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক প্রদেশীয় অধস্তন দেওয়ানী আদালতের গঠন ও ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন বিধি বা নিয়মাবলী দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা,

আসাম, ও যুক্ত-প্রদেশে নিম্নোক্ত প্রকারের দেওয়ানী আদালত আছে :— (১) জেলা-জজ, (২) অতিরিক্ত-জজ, (৩) সবজজ, (৪) মুন্সেফ। জেলা-জজ, অতিরিক্ত-জজ, এবং সবজজগণের ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের গ্রহণ যোগ্য যে সকল মোকদ্দমা নূতন দায়ের হয় সেই সমূহেই বিস্তৃত। সাধারণতঃ এক সহস্র মুদ্রার দাবীর মোকদ্দমা মুন্সেফগণ বিচার করিতে পারেন; তবে কোন কোন্ ক্ষেত্রে তাঁহারা দুই সহস্র দাবীর মোকদ্দমাও গ্রহণ করিতে পারেন। প্রেসিডেন্সী নগরে ও মফঃস্বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা বিচারের জন্য স্মলকজকোর্ট সমূহ রহিয়াছে।

সাধারণতঃ, প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া জেলা ও দায়রা-জজ নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এরূপ জজ আদিম ও আপীল বিচার ব্যতীত শাসন ও ঐ জিলাস্থ অন্যান্য দেওয়ানী আদালত সমূহে কার্য্য বিভাগ ও শাসন সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করেন। এই সকল পদের জন্য ভারতীয় সিভিল-সার্ব্বিস বা প্রাদেশিক সিভিল-সার্ব্বিসের সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন। লর্ড ইসলিংটনের সভাপতিত্বে ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে এই সকল বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যকীয় প্রশ্নের আলোচনা চলিতেছে।

হাইকোর্টের অধীন আদালত গুলিতে ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার-কালে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইয়া থাকে :—প্রত্যেক প্রদেশে কতকগুলি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি জেলা আছে এবং এই সকল জেলার প্রত্যেকটীতে দায়রা-জজের অধীনে একটী করিয়া দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতিরিক্ত ও সহকারী সেসন জজও নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। যতগুলি আবশ্যক ততগুলি নিম্ন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট (জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে নিযুক্ত হইতে পারেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া এক শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। দণ্ড প্রয়োগ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাসমন্বিত ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ইহাদিগকে আখ্যা প্রদান করা হয়।

ফৌজদারী আইন বা অন্য আইনানুমোদিত যে কোন দণ্ড হাইকোর্ট বিধান করিতে পারেন। জজও আইন সঙ্গত যে কোন দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট কর্তৃক মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক। দায়রা আদালতে মোকদ্দমার বিচার আসেসরগণ বা জুরীদিগের সাহায্যে হইয়া থাকে। প্রথমোক্তগণ জজকে সাহায্য করেন কিন্তু তাঁহাদের মত বিচারকগণ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। এই সকল বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আদেশানুসারে সম্পাদিত হয়। দায়রার জজ যদি মনে করেন যে জুরীগণ অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তবে তিনি ঐ মত হাইকোর্টে জ্ঞাপন করিতে পারেন। হাইকোর্ট ঐ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য বা রূপান্তরিত করিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারকালে নয়জন জুরী থাকেন; অন্যান্য বিচারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে নয় জনের অনধিক অসমান সংখ্যক জুরী নিযুক্ত হন। হাইকোর্টে বিচারকালে জুরীগণ এক মত হইলে জজের অমত হইলেও জুরীগণের মতই গ্রাহ্য করা হয়। সপারিষদ গবর্ণর-জেনেরাল এবং যে প্রদেশে ঘটনা ঘটে, সেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই দয়া প্রকাশ করিয়া ক্ষমা করিবার বিশেষ অধিকার পরিচালনা করিতে পারেন। ইহাতে সম্রাটের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার ব্যতিক্রম হয় না।

সম্রাটের স্বভাবজ যে সাধারণ ক্ষমতা আছে তদ্দারা তিনি সাগর পারের (অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও উপনিবেশ সমূহের) প্রজাগণের আপীল শ্রবণ করিতে

পারেন ; এই অধিকার পার্লিয়ামেণ্টের বিধিসমূহ দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্ত্তমানে এই ক্ষমতা ১৮৩৩ সালের এক আইন দ্বারা প্রিভি-কাউন্সিলের বিচার বিভাগ পরিচালন করেন। এই বিভাগে সম্রাট্ সকল প্রকার পরামর্শের জন্য যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; এতদ্ব্যতীত, ভারতবর্ষের আপীল সমূহ হাইকোর্ট সম্বন্ধীয় চার্টার্ ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান ও কাউন্সিলের নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালিত হয়। হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রায়, হুকুম বা দণ্ডের বিরুদ্ধে অথবা যে সকল মোকদ্দমায় আইন ঘটিত বিষয় হাইকোর্টের মতামতের উপর নির্ভর করে, সেই সকল ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাইকোর্ট আপীলের যোগ্য বিবেচনা করিলে বিলাতে আপীল গ্রহণীয় হইতে পারে। তবে উক্ত জুডিসিয়াল কমিটী বিবেচনা করিলে, ব্রিটীশ ভারতের নিয়মাবলী সত্ত্বেও স্বাধীন ভাবে আপীল করিবার বিশেষ আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজস্ব এবং আয়ব্যয়

ভূমিরাজস্ব ট্যাক্স নহে—সেটেলমেণ্টের (বন্দোবস্ত) শ্রেণী বিভাগ—চিরস্থায়ী, জমিদারী কিম্বা তালুকদারি বা রাইয়োতারি—তাহাদের বিবরণ—ট্যাক্স ব্যতীত অন্য প্রকার রাজস্বের মূল—ভূমি—রাজস্ব—অহিফেন—বনবিভাগ—দেশীয় রাজন্যবৃন্দের কর—ডাকঘর, তার-বিভাগ, রেল, খাল,—ট্যাক্স,—লবণ,—আবকারী—শুল্ক,—ষ্ট্যাম্প—প্রাদেশিক কর—আয়-কর—রেজেষ্ট্রী ফি—ব্যয়ের প্রধান দফা—অসামরিক বিভাগ—বিবিধ অসামরিক ব্যয়—ডাকঘর, তারবিভাগ এবং টাকশাল—খাল বিভাগ—পূর্ত্ত—সাধারণ ঋণের সুদ—সামরিক ব্যয়—অসাধারণ ব্যয়—"হোম চার্জেস্" এর প্রকৃতি—ভারতীয় আয় ব্যয়ের সংরোধ—বিকেন্দ্রীকরণ—রেভিনিউ বোর্ড।

কিয়ৎপরিমাণে ট্যাক্স হইতে ও কিয়ৎপরিমাণে ট্যাক্স ব্যতীত অন্য উপায়ে ভারতীয় রাজস্ব সংগৃহীত হয় রাজস্বের সর্ব্বপ্রকার উপায়ের মধ্যে ভূমি-রাজস্বই প্রধান। বহু প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকের মতে ভূমি-রাজস্বকে প্রকৃত পক্ষে ট্যাক্স বা কর বলা যায় না। স্যার জন্ ষ্ট্র্যাচী বলেন যে, ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে এইরূপ প্রথা আছে যে দেশের রাজার স্বীয় অধিকার হস্তান্তর বা সীমাবদ্ধ না করিলে দেশের প্রত্যেক ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ পাইবার অধিকার ছিল। ইহাই ভূমি-রাজস্ব নামে কথিত হইত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে, ভারতীয় রাজস্বের অধিকাংশই করস্থাপন ব্যতিরেকেই পাওয়া যায়। জাতীয় ব্যবহারের জন্য রাজাকে অর্থ না দিয়া ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যে অর্থ সাধারণতঃ দেওয়া হইত তাহাই আটকাইয়া লইয়া এই ভূমি-রাজস্ব পাওয়া যায় অর্থাৎ জমিদারদিগকে

খাজনাস্বরূপে প্রজা যাহা দিত গবর্ণমেণ্ট কেবল সেই অর্থই রাজস্বরূপে লইয়া থাকেন।

অন্য একজন লেখক বলেন বর্ত্তমান ভারতের ভূমিরাজস্ব দেশের স্মরণাতীত কালের প্রথা হইতে উৎপন্ন এক প্রকারের জাতীয় আয়। বিভিন্ন প্রদেশ যেরূপ ক্রমশঃ ইংরাজের কর্ত্তৃত্বে আসিতে লাগিল, মোগল আমলের করগ্রহণ প্রথাও সেইরূপ ক্রমশঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে লাগিল। ভারত-শাসনকালে ক্রমাগত কর হ্রাস করিতে হইয়াছে।

ভারতে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অল্পকালস্থায়ী বন্দোবস্ত। শেষোক্ত বন্দোবস্ত আবার দুই প্রকারের—(১) জমিদারী (কোন কোন প্রদেশে মালগুজারী বা তালুকদারী নামেও কথিত হয়) (২) রায়োতারী।

বঙ্গদেশে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেণ্ট জমিদার নামক এক প্রকারের মধ্যস্থ ভূস্বামী দেখিতে পাইলেন। ইহারা ভূমিরাজস্ব ও কর সংগ্রহ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকেই ভূমির অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বা খাজনারূপে যাহা দেশের রাজার প্রাপ্য তাহাই ভূমি রাজস্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয় হইল। জমিদার-দিগের ভূমিরাজস্ব চিরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কেবল এই উদ্দেশ্য ছিল না ; প্রজার জমা-স্বত্ব ও খাজনা চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে এরূপ উদ্দেশ্যও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিল। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান, যুক্তপ্রদেশ ও মান্দ্রাজের কিয়দংশ এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

রাজস্ব প্রদানকারিগণ স্বয়ং ভূমিতে চাষ আবাদ করুক কিম্বা তাহাদের প্রজাতেই করুক জমিদারী বন্দোবস্তে জমিদার কিম্বা ভূম্যধিকারীদিগের

দল সরকারী রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকে। করস্থাপনের জন্য ক্ষেত্র একক ("unit") বলিয়া বিবেচিত হয় না; সমস্ত গ্রাম খানিকেই একক ধরা হয়। সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের সহিত কৃষকদিগের কোন আদান প্রদান নাই। এইরূপ বন্দোবস্ত প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় প্রচলিত। পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে সাধারণতঃ ২০ বৎসরের জন্য এবং অন্যান্য প্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

৩০ বৎসরের জন্য যে কর নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা প্রদান করিলেই রায়োতারী বন্দোবস্তে রায়ত বা প্রজার নিজ ভূমির উপর স্বত্ব থাকে। আবাদী বৎসর শেষ হইলে সমস্ত ক্ষেত্রে বা কোন একটা ক্ষেত্রে প্রজা ইচ্ছা করিলে ইস্তফা দিতে পারে। প্রজা স্বয়ং ক্ষেত্রের কোন উন্নতি করিলে পুনর্বন্দোবস্তের সময় সে কারণে তাহার ভূমিকর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের সম্মতি না লইয়া প্রজা তাহার ভূমি বিক্রয় করিতে বন্ধক বা ভাড়া দিতে পারে। প্রজার মৃত্যু হইলে তাহার সন্তানেরা উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে সে ভূমি ভোগ দখল করিতে পায়। এরূপ প্রজা চাষীভূম্যধিকারী (Peasant-Proprietor); তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহার সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। এরূপ বন্দোবস্ত বোম্বাই, ব্রহ্ম, আসাম, বেরার প্রদেশে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে।

জমিদারী বন্দোবস্তের অঞ্চলে ভূম্যধিকারীরা যে খাজনা সংগ্রহ করে প্রত্যেক বন্দোবস্তের সময় ভূমিরাজস্ব সাধারণতঃ তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অল্প নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। রায়োতারী বন্দোবস্তের অঞ্চলে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্যের $\frac{1}{6}$ হইতে $\frac{1}{16}$ অংশ পর্য্যন্ত ভূমি রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হয়।

ভূমিরাজস্বের নিম্নেই অহিফেন হইতে কর সংস্থাপন ব্যতীত রাজস্ব আদায় হয়। কিয়ৎপরিমাণে অহিফেন উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার হইতে এবং কিয়ৎপরিমাণে দেশীয় রাজ্য হইতে সাগর পথে রপ্তানী বা

ব্রিটীশ-ভারতে আমদানী অহিফেনের উপর শুল্ক আদায় করিয়া অহিফেন রাজস্ব পাওয়া যায়। অহিফেন-গাছ ব্রিটীশ-ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে কিন্তু কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান ব্যতীত বঙ্গদেশ ও যুক্তপ্রদেশের কিয়দংশে ইহার চাষ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। এই দুই প্রদেশে এই ফসলের উৎপাদন গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিভাগের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর কি পরিমাণে ইহার চাষ হইবে তাহা এই বিভাগ হইতে নির্দ্দিষ্ট হয়। অহিফেনের কৃষকদিগকে চাষের জন্য লাইসেন্স্ বা অনুমতি লইতে হয়। লাইসেন্স্ ফি এবং পূর্ব্বোক্ত শুল্ক হইতেই প্রধানতঃ অহিফেন রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্প্রতি চীনদেশের গবর্ণমেণ্ট অহিফেনের আমদানী ও ব্যবহার নিষেধ করায় অহিফেন রাজস্বের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার পরেই বনবিভাগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বনবিভাগের রাজস্ব বাহাদুরিকাষ্ঠ ও বনজাত অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতেই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তে যাইবার পূর্ব্বে বিস্তৃত ও মূল্যবান্ ভারতের বনানী রক্ষার জন্য কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় নাই। দুই লক্ষ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া এই বনানী অবস্থিত এবং বনবিভাগের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত।

দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে প্রাপ্ত কর রাজস্বের আর একটি উপায়। পূর্ব্বকালে সৈন্য রক্ষা বা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য যে বাধ্যবাধকতা ছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তেই প্রধানতঃ এই কর প্রদত্ত হয়। ভারতগবর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশের শান্তি রক্ষার জন্য যে কর্ত্তব্য পালন করেন এই কর তাহার যৎসামান্য প্রতিদান।

করসংস্থাপন ব্যতীত রাজস্বের অন্যান্য সাধারণ দফাগুলি এই—ডাকঘর, তারবিভাগ, রেলওয়ে ও খাল।

করসংস্থাপন দ্বারা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত রূপে রাজস্ব পাওয়া যায়—

(১) লবণ—ভারতে প্রস্তুত বা আমদানী লবণের উপর শুল্ক আদায় করিয়া লবণের রাজস্ব সংগৃহীত হয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত মণ প্রতি ⅞ টাকা হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ৩¼ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক আদায় হইত। এখন সর্ব্বত্র মণ করা ১৲ টাকা শুল্ক আদায় হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-দেশোৎপন্ন অধিকাংশ লবণে মণ করা ॥০ আনা শুল্ক আদায় হয়। শুল্কের ক্রমাগত হ্রাসে ভারতের সর্ব্বত্র লবণবিক্রয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাগর পার হইতেই যে কেবল লবণের আমদানী হয় তাহা নহে; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লবণ প্রস্তুত হয় এবং রাজপুতানার হ্রদে ও গহ্বরে ও পঞ্জাবের খনিতেও পাওয়া যায়। আমদানীর বন্দরে ও লবণের কারখানায় শুল্ক আদায় হইয়া থাকে।

লবণের কারখানাগুলি যে যে প্রদেশে অবস্থিত কতকগুলি কারখানা সাক্ষাৎ ভাবে সেই সকল গবর্ণমেণ্টের অধীন কিম্বা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত। অবশিষ্ট কারখানাগুলি সাধারণ লোকের। সুতরাং লবণ প্রস্তুত কার্য্যটি গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায় নহে। সকলেই বিদেশ হইতে লবণের আমদানী করিতে পারে। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরস্থ জেলা গুলির ন্যায় যে স্থানে শুল্ক আদায় করা কার্য্যতঃ অসম্ভব কেবল সেই সকল স্থানে লবণ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দেওয়া হয় না।

এই লবণ শুল্কই একমাত্র কর যাহা ভারতের জনসাধারণকে বাধ্য হইয়া প্রদান করিতে হয়।

(২) আবকারী—ভারতবর্ষে, মাদকতা উৎপাদনকারী পানীয়, গাঁজা, চরস, কোকেন এবং অহিফেনের যে কাট্‌তি হয় তাহা হইতেই আবকারী বিভাগের রাজস্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই কর, বিক্রয় করিবার অনুমতির ফিস্ (fees) ও প্রস্তুত করিবার কালে শুল্করূপে আদায় করা হয়। এই বিভাগের রাজস্ব প্রায়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই আয় বৃদ্ধির

প্রধান কারণ এই বিভাগের উন্নত পরিচালন এবং গুপ্তভাবে মদ চোয়াই ও বিক্রয়ের দমন। কিন্তু বহু লোকে এ কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে।

(৩) শুল্ক—শুল্ক বিভাগের রাজস্ব প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত উপায়ে সংগৃহীত হয়। (ক) আমদানী দ্রব্যের মূল্যের উপর শত করা ৫ টাকা সাধারণ আমদানী শুল্ক, (খ) সুরা, কেরোসিনের ন্যায় দ্রব্যের উপর বিশেষ আমদানী শুল্ক, এবং (গ) চাউল ও আটার উপর মণ করা তিন আনা রপ্তানী শুল্ক। ভারতজাত বা বিদেশ হইতে আমদানী কার্পাস সূত্রের কোন শুল্ক লাগে না, কিন্তু অন্য দেশ হইতে আমদানী বা ভারতের মিলে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রের মূল্যের উপর শত করা ৩৷৷০ টাকা হিসাবে শুল্ক দিতে হয়। হস্তচালিত তাঁতের কাপড় শুল্কের দায় হইতে অব্যাহতি পায়। চিনির ন্যায় যে সকল মাল বিদেশে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হয় সেই সকল দ্রব্যের উপর সাম্যাবস্থাকারী শুল্ক (সাহায্য-জনিত প্রতিযোগিতার সুবিধা দূর করিতে) স্থাপন করিতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে।

(৪) ষ্ট্যাম্প—খত বা তমসুক, চেক, হুণ্ডী, রসীদ ইত্যাদি ব্যবসায়ের দলীল দস্তাবেজের ষ্ট্যাম্প হইতে এই বিভাগের আংশিক আয় হয়। নালিশের আর্জ্জি, আবেদন আদি যে সকল কাগজপত্র আদালতে পেশ করা হয় তাহার ষ্ট্যাম্প দ্বারা ফিস্ আদায় করিয়া এই বিভাগের আয়ের অপরাংশ সংগৃহীত হয়।

(৫) প্রাদেশিক কর—এই করের অধিকাংশ স্থানীয় উদ্দেশ্যে ভূমির উপর সংস্থাপিত হয়; যথা পথ, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল ও খালের জন্য কর, চৌকীদারী ট্যাক্স, পাটোয়ারির ট্যাক্স ইত্যাদি।

(৬) আয়কর—ইহাকে প্রত্যক্ষ-কর বলে—অর্থাৎ এই করই কেবল সাক্ষাৎ ভাবে অর্থ দিয়া প্রদান করিতে হয়। লবণ, সুরা বা কার্পাসের

ন্যায় পণ্যের উপর যে কর সংস্থাপিত হয় তাহাকে অপ্রত্যক্ষ-কর বলে। যে দ্রব্যের উপর কর সংস্থাপিত হয় সে দ্রব্য যে ব্যক্তি ক্রয় করে সেই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে কর প্রদান করে; কারণ করের জন্য ক্রীত দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। করের অংশ মূল্যের মধ্যে ধরা হয় বলিয়া কর বলিয়া সাক্ষাৎ ও স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রদান করিতে হয় না। পোল-ট্যাক্সও মাথা পিছুকর (অর্থাৎ লোক পিছু যেখানে ট্যাক্স দিতে হয়) ট্যাক্সও প্রত্যক্ষ কর কারণ ইহাও সাক্ষাৎ ভাবে অর্থ দিয়া প্রদান করিতে হয়। লাইসেন্স ট্যাক্সও (অনুমতির জন্য কর) এই প্রকারের। আয়করও এক প্রকারের প্রত্যক্ষ-কর ; যেহেতু যাহার কর সংস্থাপন-যোগ্য আয় আছে সে অর্থ দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে এই কর প্রদান করে কিংবা তাহার আয় হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। লবণ ক্রয় কালে খরিদদার বুঝিতে পারে না যে, সে কোন প্রকার কর দেয়; এরূপ স্থলে সে অপ্রত্যক্ষ-কর দিতেছে বলিয়া কথিত হয়।

বেতন, পেন্সন কিম্বা কোম্পানির কাগজের সুদের আয় বাৎসরিক ২০০০৲ টাকার অধিক হইলে টাকা প্রতি ৫ পাই, ২০০০৲ টাকার ন্যূন হইলে টাকা প্রতি ৪ পাই আয়কর আদায় করা হয়। খরচ বাদে যৌথ-কারবারে যে লাভ থাকে তাহার টাকা প্রতি ৫ পাই আয়কর লওয়া হয়। অন্যান্য প্রকারের আয়ের কর একটি আনুপাতিক তালিকা অনুযায়ী সংগৃহীত হয়। বাৎসরিক ১০০০৲ টাকার ন্যূন আয়ে কোন প্রকার আয়কর দিতে হয় না। কৃষিকার্য্যের আয় বা লাভে কিম্বা সামরিক বিভাগের বার্ষিক ৬০০০৲ টাকার ন্যূন আয়েও কোনরূপ আয়কর দিতে হয় না।

(৭) দলীল রেজেষ্ট্রী করিবার ফিস্—ইহাতে যৎসামান্যই রাজস্ব সংগৃহীত হয়।

রাজ্যের ব্যয়ের প্রধান দফাগুলি এই—

(১) অসামরিক-বিভাগ—ইহার মধ্যে আছে (ক) সাধারণ শাসন বিভাগ, (খ) বিচারালয়, (গ) পুলিশ, (ঘ) নৌ-বিভাগ, (ঙ) শিক্ষা, (চ) চিকিৎসা, (ছ) রাজনৈতিক, (জ) ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ও (ঝ) ক্ষুদ্রতর বিভাগ —যথা ভারতীয় জরীপ, উদ্ভিজ্জ ও ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় জরীপ, আবহবিদ্যা-সম্বন্ধীয় (meteorological) ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক-বিভাগ, কৃষিসম্বন্ধীয় পরীক্ষা, বিদেশে কুলিচালান এবং বিভিন্ন প্রকারের অন্যান্য ব্যয়।

(১) সাধারণ শাসনবিভাগে (বিভাগীয় কমিশনারের পর্য্যন্ত) সমস্ত শাসন-বিভাগের ব্যয় ধরা হয়। ইংলণ্ডে ও ভারতে ভারত-সচিব, রাজপ্রতিনিধি, অন্যান্য লাটসাহেব, ছোটলাট, সচিব ইত্যাদির ব্যয় ইহার অন্তর্ভূত।

(২) বিবিধ অসামরিক ব্যয়—প্রাদেশিক ও রাজনৈতিক বৃত্তি, ষ্টেশনারি (কাগজ, কলম, কালী ইত্যাদি) ও মুদ্রণ বিভাগ ইহার অন্তর্গত।

(৩) ডাক, তার এবং টাকশাল।

(৪) খাল।

(৫) পূর্ত্ত-বিভাগ—এই বিভাগে রাস্তা ও অট্টালিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

(৬) সাধারণ ঋণের সুদ—গবর্ণমেণ্টের ঋণের মধ্যে সাধারণ ঋণ এবং সাধারণ কার্য্য—যথা রেলওয়ে—নির্ম্মাণ ও পরিচালন জন্য ঋণ উভয়ই ধরা হয়।

(৭) সামরিক ব্যয়—সৈন্য রক্ষা ও সামরিক কার্য্য পরিচালন এই উভয় ব্যয় ইহার অন্তর্গত।

(৮) অসাধারণ ব্যয়—ইহার মধ্যে ধরা হয়, (ক) সৈন্য পরিচালন, (খ) দেশ রক্ষার্থ বিশেষ ব্যবস্থা, (গ) দুর্ভিক্ষ দমন, (ঘ) রাজস্ব হইতে

রেলওয়ে নির্ম্মাণ (ঙ) দুর্ভিক্ষ দমনার্থ প্রদত্ত অর্থ হইতে রেল ও খাল নির্ম্মাণ।

যাহাকে "হোমচার্জ্জেস্" (ভারতশাসনের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত অর্থ) বলে তাহা উপযুক্ত কয়েকটি ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ ভাগই ইংলণ্ডের প্রদত্ত মূলধন ও উপকরণের জন্যই প্রদত্ত হয়। সুতরাং ইহাকে শাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপার না ভাবিয়া ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। * "হোমচার্জ্জেস্"এর একাংশ ফার্লো (রাজ কর্ম্মচারীর দীর্ঘ অবকাশ) কালীন বেতন ও পেন্সন দিতে ব্যয় হয়। অন্যান্য প্রধান ব্যয়গুলি এই—রেলওয়ে রাজস্ব ঋণের সুদ ও পরিচালন, রসদ, সৈন্যের কার্য্যোপযোগী ব্যয়, অসামরিক শাসন বিভাগ, নৌবিভাগ। এই প্রশ্নের কয়েকটি দিক সম্প্রতি "ফাইন্যান্স কমিশন" (আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় বৈঠক) লণ্ডনে বসিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এই ফাইন্যান্স কমিশনের সভাপতি ছিলেন অষ্টিন্ চেম্বারলেন্ সাহেব।

ভারতীয় আয়ব্যয় পরিচালনের চূড়ান্ত দায়িত্ব পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতসচিবের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ভারতসচিব ভারত-গবর্ণমেণ্টের হস্তে এত অধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে তাহার বলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রকার খরচের অনুমোদন এবং ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনে নূতন কার্য্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট যতদূর খরচ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে কার্য্যতঃ কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই।

১৮৬০ খৃঃ গবর্ণর-জেনারেলের মন্ত্রী সভার প্রথম আয়-ব্যয়-সচিব জেম্স্ উইল্সন্ সাহেব কর্ত্তৃক সমস্ত ভারতে প্রকৃত আয় ব্যয় পরিচালন ও

* ১৯১১-১২ খৃঃ ১ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড কেবল ইংলণ্ডের প্রদত্ত মূলধন ও উপকরণের মূল্যের সুদ স্বরূপে প্রদত্ত হয়।

সরকারী হিসাবের এক কার্য্যোপযোগী প্রথা প্রচলিত হয়। ব্রিটীশ ভারতের সমস্ত প্রদেশ-জাত সমুদয় রাজস্ব এক ধনভাণ্ডার বলিয়া পরিগণিত হইত। কেবল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট তাহা হইতে ব্যয় অনুমোদন করিতেন। প্রদেশিক গবর্ণমেণ্টকে নূতন ব্যয় করিতে কোনরূপ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইত না।

এরূপ প্রথা অত্যন্ত অনুপযোগী দেখিয়া ইহার অসম্পুর্ণতা দুর করিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকার্য্যের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিবার প্রথা ১৮৭১ খৃঃ লর্ড মেয়ো প্রবর্ত্তিত করেন। এই প্রথায় অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে মিতব্যয় করিতে হইত কিম্বা প্রয়োজন হইলে স্থানীয় কর সংস্থাপন করিতে হইত। এরূপ প্রথাকে আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় বিকেন্দ্রীকরণ বলে। ভূমি, ষ্ট্যাম্প ও আবকারীর রাজস্ব, সংস্থাপিত কর এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ে সংগৃহীত রাজস্ব ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে বিভক্ত হয়। অন্যান্য বৃহৎ উপায়ে সংগৃহীত রাজস্ব শুধু ভারত-গবর্ণমেণ্টই লইয়া থাকেন। একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (প্রায়ই ৫ বৎসরের জন্য) এরূপ একটা বন্দোবস্ত করা হয় যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি রাজস্ব হইতে কতকগুলি ব্যয় করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই ব্যয় নিম্নলিখিত বিষয়ে করিতে হয়—সাধারণ শাসন কার্য্য, ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ, বিচারালয়, কারাগার, পুলিশ, শিক্ষা, চিকিৎসা-বিভাগ, অট্টালিকা, রাজপথ এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যয়। প্রদত্ত রাজস্ব পরিচালন করিবার অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আছে; প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পরিমিতব্যয় জনিত সুবিধা ভোগ করেন এবং বন্দোবস্তের সময়ে প্রদত্ত রাজস্ব বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত বর্দ্ধিত রাজস্ব বা তাহার কোন অংশ পাইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কোনরূপ কর প্রদান করে না কিংবা স্বীয় শাসন কার্য্যের জন্য ইংলণ্ড হইতে কোনরূপ আর্থিকসাহায্য প্রাপ্ত হয় না। ভারতরক্ষার্থ ব্রিটীশসৈন্য ও ইণ্ডিয়া-আপিসের (ভারতশাসন জন্য ইংলণ্ডস্থিত ভারত-কার্য্যালয়) ব্যয়পর্য্যন্ত ভারতসাম্রাজ্য পরিচালনার সমুদয় ব্যয় ভারতকেই বহন করিতে হয়।

যুক্তপ্রদেশে ও মান্দ্রাজে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে রেভিনিউ-বোর্ডকর্তৃক রাজস্ববিভাগ পরিচালিত হয়। বঙ্গদেশে পূর্ব্বকালে দুইজন সদস্য লইয়া এক রেভিনিউ-বোর্ড ছিল। এই সদস্য সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া একজন হইয়াছিল; অবশেষে রেভিনিউ-বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রেভিনিউ-বোর্ডের কার্য্য এখন নবগঠিত শাসনপারিষদ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে "ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনার" নামক একজন রাজপুরুষ রেভিনিউ-বোর্ডের কার্য্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের স্বতন্ত্র রেভিনিউ-বোর্ড ছিল কিন্তু উক্ত প্রদেশের সহিত রেভিনিউ-বোর্ডও উঠিয়া গিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যায় রেভিনিউ-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্য—ইহাদের সংখ্যা, প্রকৃতি, উৎপত্তি—শ্রেণী বিভাগ—ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার ও কর্ত্তব্য—দেশীয় রাজ্যের ক্ষমতা কিরূপ সীমাবদ্ধ—বাজেয়াপ্ত নীতি—এরূপ নীতির পরিহার—দেশীয় রাজন্যদিগের উত্তরাধিকারীর অভাবে ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষ বলিলে কেবল ভারতের ব্রিটীশশাসিত প্রদেশগুলি অর্থাৎ ইংলণ্ডেশ্বর-নিয়োজিত ভারতের গবর্ণরজেনারল বা তাঁহার অধীন রাজ-পুরুষ দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলি বুঝায় না, প্রত্যুতঃ ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন দেশীয় রাজন্য বা সামন্তবৃন্দ কর্ত্তৃক শাসিত প্রদেশগুলিকেও বুঝায়। শেষোক্ত প্রদেশগুলিকে দেশীয় রাজ্য বলে। এ গুলির সংখ্যা প্রায় সাত শত। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক আদমসুমারির মতে এ গুলির পরিমাণ ও লোক সংখ্যা এই পুস্তকের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। "দেশীয় রাজ্য" বলিলে এইরূপ অর্থ বুঝায় যেন বৃহৎ বিদেশীয় রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি ভারতীয় বিভিন্ন জাতি অবস্থান করিতেছে। স্যার জন্ ষ্ট্র্যাচী বলেন, "এরূপ কল্পনা অপেক্ষা আর কিছুই ঘটনাবিরুদ্ধ হইতে পারে না। ১৭০৭ খৃঃ আওরংজেবের মৃত্যুর পরে যখন মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছিল তখন সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল এবং অষ্টাবিংশ শতাব্দির অধিকাংশ কাল ও উনবিংশ শতাব্দের প্রথমাংশ ধরিয়া এই বিবাদ বর্ত্তমান ছিল। মহারাষ্ট্রজাতি, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শক্তি ও ইংরাজ জাতি এই বিবাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের বৃহৎ অংশ ইংরাজের ভাগেই পড়িল বলিয়া ইংরাজজাতি অপেক্ষা

অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগেরও কিছু প্রকৃত দাবী ছিল না। যে প্রদেশের জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতেছিল সে প্রদেশে সকলেই বিদেশী।" স্যার আলফ্রেড্ লায়াল্ বলেন "ইংরাজেরা যে এত শীঘ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, যে সকল প্রদেশ ইংরাজদের হস্তে পড়িয়াছিল সে সকল প্রদেশে কোন জাতি (যেমন ইংরাজ, ফরাসী) ছিল না; পুরাতন রাজবংশ বা সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে সে প্রদেশে এরূপ কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। * * অপর পক্ষে যেথানে বহুদিনের স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে সেথানে ইংরাজজাতিই সেগুলিকে ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

দেশীয় রাজ্যগুলি মোটামুটি ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১) যে সকল রাজ্যের ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে। (২) যে সকল রাজ্য গবর্ণরজেনারলের এজেণ্টের অধীন। (৩) যে সকল রাজ্যের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে।

প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। সেগুলি এই— (১) নেপাল (২) হায়দ্রাবাদ (৩) মহীশূর (৪) বরোদা (৫) কাশ্মীর এবং জম্মু।

নেপালের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে ইহা স্বাধীন, কিন্তু ইহার বৈদেশিক সম্বন্ধ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়মিত। নেপাল একজন ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট রাখিতে বাধ্য এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন ইউরোপীয়কে কর্ম্মচারীরূপে রাখিতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যগুলি ইহার পরেই উল্লেখ যোগ্য। এগুলি তিনটি এজেন্সীর অধীন (১) মধ্যভারতীয় এজেন্সী (২) রাজপুতানা এজেন্সী ও (৩) বেলুচিস্থান এজেন্সী। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভুপাল ও

রেওয়া প্রথম এজেন্সীর প্রধান রাজ্য। উদয়পুর (মেওয়ার), জয়পুর, যোধপুর (মারোয়ার), ভরতপুর, বিকানীর, আলোয়ার ও ধোলপুর দ্বিতীয় এজেন্সীর বিখ্যাত রাজ্য। এজেন্সীগুলির মোট রাজ্য সংখ্যা ১৭০।

ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সিকিম, কুচবিহার, পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা, ভুটান ও ময়ূরভঞ্জ বঙ্গদেশের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যে প্রভুশক্তিরূপে—(ক) দেশীয় রাজ্যের বৈদেশিক সম্বন্ধ বিষয়ে একমাত্র কর্ত্তৃত্ব করেন।

(খ) রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ কিন্তু সীমাবদ্ধ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(গ) ব্রিটীশ প্রজা দেশীয় রাজ্যে বাস করিলে তাহার নির্ব্বিঘ্নতা ও মঙ্গলের জন্য বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(ঘ) বৈদেশিক আক্রমণ নিবারণ ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য্যে দেশীয় রাজ্যের আংশিক সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

দেশীয় রাজ্যের কোন আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব নাই। ইহা অন্য রাজ্যের সহিত কোন যুদ্ধ করিতে পারে না। ইহা কোন নিকটবর্ত্তী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা বন্দোবস্ত করিতে পারে না। ইহা এসিয়া, ইয়ুরোপ বা অন্য স্থানের কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির সহিত কোনরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন বা রক্ষা করিতে পারে না।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিবার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার আছে এবং ইহা কর্ত্তব্যও বটে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ দেশীয় রাজন্যবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে আভ্যন্তরিক বিদ্রোহে তাঁহাদের রাজ্যচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই। ইহাতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দও অসহ্য কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'কাইশর্-ই-হিন্দ্' বা ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ দ্বারা ১৮৭৭ খৃঃ ভারতের সমুদয় দেশীয় রাজ্যের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রভূত্ব ঘোষিত হয়।

লর্ড ডালহৌসী প্রথমে বাজেয়াপ্ত নীতির সৃষ্টি ও প্রবর্ত্তন করেন। অর্থাৎ কোন দেশীয় রাজা উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট সেই দেশীয় রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিতেন; দত্তক-পুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহীবিদ্রোহের পরে এই নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই ভয়াবহ সঙ্কটকালে দেশীয় রাজ্যগুলি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল। লর্ড ক্যানিং বলিয়াছিলেন "যে ঝটিকা আমাদিগকে এক বৃহৎ তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলি আমাদিগকে সেই তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।" লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রধান প্রধান হিন্দু রাজন্যবর্গকে ইংলণ্ডেশ্বরীর নামে সনন্দ দিয়াছিলেন যে, স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের বংশের কোন ভবিষ্যৎ রাজা হিন্দু শাস্ত্র কিংবা বংশের প্রথামত যাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবেন, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকেই উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করিবেন। মুসলমান রাজন্যগণকেও এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে মুসলমান শাস্ত্র-সঙ্গত প্রত্যেক প্রকারের উত্তরাধিকারীকেই গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিবেন। এখানে যে নীতির উল্লেখ করা হইল এ পর্য্যন্ত তাহা ভঙ্গ করা হয় নাই। যেখানে কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয় না সেখানে গবর্ণমেণ্ট উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দেন এবং দেশীয় রাজা নাবালক হইলে যথারীতি শাসন পরিচালন কার্য্যের ব্যবস্থা করেন।

সম্পূর্ণ